শ্রীশ্রীলোকনাথো জয়তি।

নিবেদন।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারিবাবা আমাকে কথাপ্রসঙ্গে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অধিকারী ভেদে যাহাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করা উচিত কিনা সেবিষয়ে এযাবৎকাল আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছিল। গুরুগীতা ও গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যও আমাকে এপর্য্যন্ত এবিষয়ে নিবৃত্ত থাকিতেই বাধ্য করিয়াছে।

"একাগ্রচিত্তে শান্তে চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতে
প্রদাতব্যমিদং তত্ত্বম্।"
"অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।
মনসাপি ন বক্তব্যম্।" ইতি গুরুগীতা।
"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥" ইতি গীতা

যে কারণে আমি এখন বাবার অমূল্য উপদেশ প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইতেছি তাহা নিবেদন করিতেছি।

আমাদের বংশ পূজ্যপাদ সর্ব্ববিদ্যাবংশের শিষ্য। আমি সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জনৈক শিষ্য পূজ্যপাদ ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পূজ্যপাদ মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশমতে এবং পরমারাধ্যা মাতৃদেবী ও অগ্রজ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে সর্ব্ববিদ্যা বংশসম্ভূত ৺অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এযাবৎ প্রথমোক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের উপদেশ যথাশক্তি প্রতিপালন করিতেছিলাম। এই সময়ে

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন। তিনি ঢাকা হইতে কয়েকবার বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার নিকট যাতায়াত করিয়াছেন এবং এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্ব্বদাই সকলের নিকট বলিতেন, "বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া, বহু পাহাড়পর্ব্বত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এপ্রকার উচ্চ অবস্থার একটী মহাপুরুষের দর্শন পাই নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এ অবস্থার লোক আর নাই। ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নাই। পাঁচমিনিটকাল তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাক্‌লে লোক মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। হিমালয় ও তিব্বতাদি স্থান হইতে যোগিগণ যোগশিক্ষা করিতে রাত্রিকালে ব্রহ্মচারিবাবার নিকট আসেন বলিয়া সন্ধ্যার সময়ই তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করা হয় এবং সেইজন্য রাত্রিতে তাঁহার ঘরে কেহ যেতে পারে না"। * তাঁহার মুখে বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত বলবতী স্পৃহা জন্মে। ভগবৎকৃপায় সেই বাসনা অচিরেই পরিপূর্ণ হওয়াতে আমিও চরিতার্থ হইয়াছি। প্রথমবার তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই স্নেহময়ী মাতা ঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলাম—"মা! বারদীর ব্রহ্মচারীর মত আপনিও আমাকে ভালবাসিতে পারেন না।" "ব্রহ্মচারী কেমন?" কেহ জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে বলিতাম—'মূর্ত্তিমান্ গীতা', 'জীবন্ত গীতা' দেখিয়া আসিয়াছি। আমার প্রত্যেক উপদেশকের উপদেশই নিতান্ত পবিত্র ও কল্যাণকর। বিশেষতঃ পরমগুরু বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার উপদেশপরম্পরা এতই উপাদেয়, মূল্যবান্, ও পবিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে যে ঈদৃশী সুদুর্লভ রত্নরাজি অথবা ভবরোগের মহৌষধসমূহ লোকচক্ষুর অগোচর

---

* মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযুক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারিকৃত "সদ্‌গুরুপ্রসঙ্গে" ১মখণ্ড ৮৬ পৃষ্ঠায়ও ঠিক এই কথাগুলি লেখা আছে।

রাখিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। তাই উহাদিগকে 'ধর্ম্মসার-সংগ্রহ' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া লোকসমাজে উপন্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। শুভ্র ও বিশুদ্ধ আকাশের জল যেমন আধারভেদে বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হয়, এই পবিত্র উপদেশগুলিও সেইরূপ মাদৃশ পাত্রে ন্যস্ত হওয়াতে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আমার গুণবিশিষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে যাহা যাহা অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই আমার; এবং যাহা যাহা পবিত্র ও মঙ্গলময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাই গুরুর বলিয়া মনে করিতে হইবে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ অপবিত্র অনুপাদেয় অংশ হংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র উপাদেয়াংশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং পবিত্র ও উপকৃত হইতে যত্ন করিবেন। ইহাতে অপবিত্র অসার কিছু আছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব আমি সজ্জন মাত্রেরই ক্ষমার যোগ্য।

উপসংহারে সহৃদয় পাঠকবর্গের সমীপে আমার অবশ্য নিবেদনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, যে যদিও ঈদৃশ পুস্তক সর্ব্বসাধারণে প্রচারযোগ্য কিনা এসম্বন্ধে এযাবৎ মতভেদ চলিতেছিল তথাপি এই গ্রন্থ প্রকাশ না করিলে এই অমূল্য রত্নগুলি রক্ষা করা সুদুষ্কর, এই ভাবিয়া ইদানীং মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই উপকারক। এতদ্দ্বারা অন্য কাহারও কিঞ্চিৎ উপকার হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। ইহাদ্বারা শিষ্যের কর্ত্তব্যও কিয়ৎপরিমাণে সংসাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

"আসনং বসনঞ্চৈব ভূষণং বাহনং তথা। গুরবে চ নিবেদয়েৎ।"

গুরুগীতার এই শ্লোকের অর্থ বাবা কিরূপ বুঝাইয়াছেন তাহা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

নিবেদক—

শ্রীযামিনীকুমার দেবশর্ম্মা, মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা।

"ধর্ম্মসার সংগ্রহের" প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে পর সহৃদয় ভক্ত পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ইহা পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ পত্রদ্বারাও হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা উৎকট আগ্রহসত্ত্বেও পুস্তকের অসদ্ভাবে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন, তাঁহারা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রহ্মচারিবাবার কৃতী শিষ্য বলিয়া পরিগণিত, যাঁহাদের সেই মহাপুরুষের প্রতি নিরতিশয় ভক্তি ও অনুরাগ আছে, তাঁহাদের সেই সদাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই মনে করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপাদেয়তা ও পুনর্মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে ঈদৃশ স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এস্থানে তাহা উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকা সঙ্গত মনে করিলাম না। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারিবাবার অন্যতম প্রধান ও প্রিয় শিষ্য তদীয় চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পত্রদ্বারা যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা অবিকল নিম্নে প্রকটিত হইল।

প্রিয় যামিনী বাবু,

"তোমার প্রণীত 'ধর্ম্মসার-সংগ্রহ' নামক পুস্তকখানা আমি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি, আমি, ও অন্যান্য বন্ধুগণ সকলেই গুরুদেব বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার চরণপ্রান্তে যাইতাম। গত ঊনবিংশ বৎসর মধ্যে কেহই উক্ত মহাপুরুষের উপদেশ বা যথার্থ ইতিবৃত্ত সাধারণের গোচর করিতে অগ্রসর হন নাই। তুমি তদীয় অমূল্য উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া

পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাতে প্রকৃত জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছ। উহা সাধারণের আদরের বিষয় হওয়াতে কতিপয় ব্যক্তির অনুরোধে তুমি উহার নূতন সংস্করণ করিতে চাও। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ পুস্তকের শেষভাগে গুরুদেবের জীবনবৃত্তান্ত সংযোগ করিবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছ। এদিকে আমার লিখিত "সিদ্ধজীবনী" নাম্নী পুস্তিকাও মুদ্রিত হইয়াছে। তুমি আবশ্যক বোধ করিলে উহা হইতে বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার বৃত্তান্ত যতদূর ইচ্ছা উদ্ধৃত করিতে পার। এই মহাপুরুষের বিবরণ প্রচারিত হইলে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হই। সম্প্রতি ঢাকাপ্রকাশ পত্রে আমি যে 'মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি, তাহারও সমগ্র কি কোন কোন অংশ, তুমি ইহাতে সংযোগ করিয়া দিলে লোকের আরও মঙ্গল হওয়ার ও প্রকৃত তথ্য জানিবার সুবিধা হইবে মনে করি। এজন্য আমি আহ্লাদ সহকারে অনুমোদন পূর্ব্বক তোমাকে এই পত্র লিখিলাম। ইতি ১৩১৫ সন, ৭৯শে পৌষ।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী।

২১৪ বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

অপিচ এই গ্রন্থখানার (ধর্ম্মসার-সংগ্রহের) সমালোচনায় ব্রহ্মচারিবাবার পরমভক্ত অন্যতম শিষ্য, রোয়াইল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার ও সুপ্রসিদ্ধ শক্তিঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্তবাবু মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, এই পুস্তক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মচারিবাবা তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রসঙ্গতঃ প্রশ্নোত্তরক্রমে সময়ে সময়ে যে কতকগুলি উপদেশ

প্রদান করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই অমূল্য ও সারগর্ভ উপদেশগুলিই সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্প কয়েকটী কথায় বাস্তবিকই ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাই বলি গ্রন্থখানা সার্থকনামা হইয়াছে। বাস্তবিকই সুগন্ধি গোলাপনির্য্যাস ও গোলাপ জলে যে প্রভেদ, এই সদুপদেশগুলি ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে ঠিক সেই প্রভেদ। কয়েক ফোঁটা দ্বারাই এক বোতল প্রস্তুত হইতে পারে। ধর্ম্মসম্বন্ধে এমন কোন প্রশ্ন হইতে পারে না, যাহার সুমীমাংসা এই কয়েকটী উপদেশ দ্বারা সুসম্পন্ন না হয়। ইহাকেই বলে **বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ।**"

এইরূপ আরও কতিপয় ভক্ত শিষ্যের প্রবর্ত্তনায় ধর্ম্মসার-সংগ্রহ দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও অনুরোধে ব্রহ্মচারিবাবার লৌকিক ও অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত, যতদূর জানিতে পারিয়াছি সংগ্রহ করিয়া, গ্রন্থের শেষ ভাগে সংযোজিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে, সিদ্ধজীবনীকার শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় তদীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহার সংগৃহীত ব্রহ্মচারিবাবার জীবনবৃত্তান্তের অধিকাংশ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া আমার প্রতি যে অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকেও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

এস্থলে আমার গুরুভাই এবং বাবার একজন প্রিয়তম শিষ্য উল্লিখিত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের সম্বন্ধে দুচার কথা না লিখিয়া চলিয়া যাওয়া একান্ত অসঙ্গত ও অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া, সংক্ষেপে তাঁহার একটু পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। বাবার এই প্রিয়তম শিষ্যের নিবাস বিক্রমপুরস্থ পশ্চিমপাড়া গ্রামে। ইনি কুলীনবংশীয়। ইহার লৌকিক

নাম শ্রীতারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। ব্রহ্মচারিবাবা দেহধারী থাকা অবস্থায় ইনি সর্ব্বদাই তাঁহার চরণ দর্শনার্থে বারদী যাইতেন। বাবা ইহাকে সবিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করিতেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিয়া বাবা আপনা হইতেই ইচ্ছা করিয়া ইহাকে 'ব্রহ্মানন্দ ভারতী' এই উপাধি প্রদান করেন। আমরা বাবার নিজ মুখেই শুনিয়াছি, তাঁহার গুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভগবান্ গাঙ্গুলী পুনরায় ব্রহ্মানন্দ ভারতী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর ভগবান্ গাঙ্গুলীর কথা অনেক স্থানেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্রহ্মচারিবাবা যখন হিমালয়ে যাইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিলেন, তখন গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর সিদ্ধিলাভ হইল না বলিয়া, তাঁহার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী ব্রহ্মচারিবাবাকে বলিয়াছিলেন—"আমি এজন্মে সিদ্ধিলাভে কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চলিয়াছি। পর জন্মে তুমি আমাকে কর্ম্মমার্গে চালাইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিও। আমি চিরদিনই জ্ঞানপথাবলম্বী। কর্ম্মদ্বারা যে মুক্তি (ব্রহ্ম) লাভ হইতে পারে, ইহা আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল না। তোমাকে দেখিয়া এখন বিশ্বাস হইল। পর জন্মে তুমি গুরু হইয়া আমাকে শিষ্যরূপে শাসন করিবে"। এই সম্বন্ধে গুরু শিষ্যের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধজীবনীতে বর্ণিত আছে। স্থানাভাবে এস্থানে তাহা বিস্তার করিয়া লিখিতে বিরত রহিলাম। বাস্তবিক 'ব্রহ্মানন্দ' গুরুদত্ত নামের সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ লক্ষণ দৃষ্টেই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, আজ হউক, কি দুদিন পরে হউক, ইনি ব্রহ্মদর্শনে চরিতার্থ হইবেন। ইনি ইদানীং ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। শিশুকাল হইতেই ইহার ব্রাহ্মণত্বের দিকে অনিবার্য্য গতি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। ইনি

যৌবনে ঢাকার নিকটবর্ত্তী নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় মুন্সেফ্ কোর্টের উকীল ছিলেন। ব্যবসায়ে বেশ খ্যাতি প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ পূর্ব্বসংস্কারের বলবতী প্রেরণায় বশীভূত হইয়া, সেই অর্থকরী জীবিকা পুরীষরাশির ন্যায় ত্যাগ করিয়া উদাসীনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন। পেন্সন্প্রাপ্ত পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অনুজ ভ্রাতা। বর্ত্তমান সময়ে অনেক উন্নতিশীল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত, তন্মধ্যে আমেরিকাবাসী আচার্য্য প্রেমানন্দ ভারতী (বাবা ভারতী) অন্যতম। শুনিতেছি বাবা ভারতী আমেরিকায় অনেক ইংরাজ শিষ্য করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতীতে যে ব্রহ্মচারিবাবার শক্তি বহুল পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে তাহার কোনও সংশয় নাই। ব্রহ্মচারিবাবা জাতিস্মর ছিলেন, তাই তিনি গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীকে তারাকান্ত জন্মেও দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা এই জন্মেও ব্রহ্মানন্দের শাস্ত্র বিষয়ে ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি এবং জ্ঞানলিপ্সা প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে ইনি, খুব সম্ভব, সেই ভগবান্ গাঙ্গুলীই হইবেন। ভগবানের সংসার ত্যাগ করিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তিও পূর্ব্ব হইতেই ছিল, অন্যথা তিনি প্রস্তাবমাত্রই ব্রহ্মচারী ও বেণীমাধবকে লইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেন না। ব্রহ্মানন্দ ও বাল্যকাল হইতেই এই সংসারবৈরাগ্যের ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাই ব্রহ্মচারীর সহিত কিয়ৎকাল আলাপের পরই তাঁহার সংসারত্যাগের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। তখনই ওকালতী ত্যাগ করিয়া উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে থাকেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার ভিন্ন হঠাৎ এরূপ মতি গতি লোকের হয় না। তাই মনে হয়, ব্রহ্মানন্দ নিশ্চিত ব্রহ্মচারিবাবার গুরু সেই ভগবান্ গাঙ্গুলীই হইবেন।

অবশেষে আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাও জানাইতেছি, যে ভাষাবিজ্ঞান প্রণেতা, ঢাকা কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ও জগন্নাথ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং শক্তিব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অবৈতনিক অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ৺রজনীকান্ত আনীন বেদান্তবাগীশ মহোদয় "ধর্ম্মসার-সংগ্রহের" রচনা ও ভ্রমসংশোধনের সাহায্য করিতে অকাতরে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক উদারতার ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। আমি অকপটভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য, যে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের সাহায্য না পাইলে আমাকর্ত্তৃক এই পুস্তকের যথাযথ প্রণয়ন কখনও সম্ভবপর হইত না। পণ্ডিত মহাশয়ের এই মহানুভবতার জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। অথবা তাহাই বা বলি কেন? ব্রহ্মচারিবাবার প্রতি তাঁহার যেরূপ অকৃত্রিম ভক্তি ও সবল বিশ্বাস দেখিতে পাই, তাহাতে আমার মনে হয়, বাবাই বা তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়া থাকিবেন।

তৃতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বহিগুলি অতি অল্প সময়েই নিঃশেষিত হওয়াতে তৃতীয় সংস্করণ করিতে বাধ্য হইলাম। দেখিতেছি বাবার অমৃতোপম উপদেশাবলী ধর্ম্মজিজ্ঞাসু সকলেরই আদরণীয় হইতেছে। মহাপুরুষের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই এইরূপ হইতেছে ও হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ।

স্কুল সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ মহামান্য ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক "ধর্ম্মসার-সংগ্রহ" ঢাকা, প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের জন্য **প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে** অনুমোদিত হইয়াছে। স্কুলে ছাত্রগণের ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। আশাকরি প্রত্যেক স্কুলের লাইব্রেরীতে এই ধর্ম্মগ্রন্থখানা শিক্ষক মহোদয়গণ রাখিয়া নিজে ইহা অধ্যয়ন করিবেন এবং ছাত্রগণকেও পড়িতে উপদেশ দিবেন।

ষষ্ঠ সংস্করণ ।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান্ প্রভৃতি বহু মহানুভব ব্যক্তি সংবাদপত্র ও পত্রাদিদ্বারা ধর্ম্মসার-সংগ্রহের বহু প্রশংসা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের আন্তরিক এই ভাব যে এই সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। বিশেষতঃ স্কুল কলেজেও যাহাতে এইরূপ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত। এই সকল কারণে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক ষষ্ঠ সংস্করণ এবং ইহার হিন্দী ও ইংরাজী সংস্করণ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুস্তকের শেষে উক্ত মহানুভব ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রশংসাপত্র সমূহের কতক সন্নিবেশিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসার-সংগ্রহের কলেবর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষষ্ঠ সংস্করণে ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইল। এই কলেবর বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা সম্পাদন সম্বন্ধে আমার গুরুভাই শ্রীমান্ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, অকাতরে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

আমার পরিজ্ঞাত ব্রহ্মচারিবাবার শিষ্যদের মধ্যে উক্ত শ্রীমান্ বাবার বিশেষ ভক্ত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীমান্ সেই ভক্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই পুস্তকখানার উৎকর্ষতা সংসাধন করিয়া আসিতেছেন। এতদ্বারা শ্রীমানের স্বাভাবিক দানশীলতা ও উদারতা সূচিত হইতেছে। উক্ত শ্রীমান্ দীর্ঘজীবী হইয়া বাবার শিষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করুক বাবার শ্রীচরণকমলে আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা।

এই পুস্তকে ব্রহ্মচারিবাবা সম্বন্ধে বহু অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের গুরুভ্রাতাদের মধ্যে যাহারা এই সকল ঘটনা ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিবাবার প্রমুখে

বহু অলৌকিক ঘটনা শ্রবণ করিয়াছেন পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিবার জন্য পরিশিষ্টে তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করা হইল।

বিনীত—

শ্রীযামিনীকুমার দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়,

ঢাকা।

শ্রীশ্রীলোকনাথো জয়তি।

ধর্ম্মসার-সংগ্রহঃ।

শ্রীশ্রীলোকনাথ স্তোত্রম্।

আজন্ম ব্রহ্মচারী ব্রতনিশিতবপু র্বীর্য্যমজ্জাস্থিসারঃ,
ব্রাহ্মং তেজঃ সমিদ্ধং শ্রিতমিব বিমলং কায়মুদ্ধূতকামঃ।
নির্লিপ্তোঽপি ত্রিলোক্যা হিতমতিকৃপয়া চিন্তয়ঁল্লিপ্ত এব,
ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ পরমগুরুরসৌ মুক্তয়েঽস্তু প্রজানাম্॥

জন্মাবধি ব্রহ্মচারী ব্রতশিতকায়।
অস্থি-মজ্জা-বীর্য্য-মাত্র-শেষ দেহ যায়॥
প্রজ্বলিত ব্রহ্মতেজঃ, পবিত্রমূরতি
ধরি যেন উপনীত, জগতের গতি।
নির্লিপ্ত তথাপি, ভাবি ত্রিলোকের হিত,
কৃপা করি লিপ্তবৎ যাঁর আচরিত॥
ব্রহ্মানন্দময় যিনি দেশিকের গুরু।
জগতের মুক্তিহেতু বাঞ্ছাকল্পতরু॥

ভাষাবিজ্ঞান প্রণেতা ও শক্তিব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অবৈতনিক অধ্যাপক
৺ রজনীকান্ত আমীন বেদান্তবাগীশ বিরচিত।

নিঃসঙ্গো বিশ্বসঙ্গী সকলজনিমতশ্চাত্মদৃষ্ট্যানুপশ্যন্,
প্রেমাক্ষিভ্যাং স্থিরাভ্যাং চিরমিহ যুগপৎ সর্ব্বসাম্মুখ্যমিষ্যন্
নির্দ্বন্দ্বঃ শুদ্ধিবুদ্ধ্যোর্নিরুপমনিলয়শ্চাত্মসংস্থো বিভূত্যা
গীতার্থৈ দেহবদ্ধো জয়তি সকলয়া লোকনাথঃ সনাথঃ।

অনাসক্ত বটে, কিন্তু আসক্ত আবার
বটে বিশ্বে—যেহেতু জনম আছে যার
তারি প্রতি আত্মবোধে দৃষ্টিপাত করে ;
স্থিরপ্রেমে তথা স্থিরনয়নে সঞ্চরে
সতত এদেশে, সবাকার সন্মুখীন
একই সময়ে হয়ে ; বটে দ্বন্দ্বহীন,
আত্মসংস্থ ; শুদ্ধি আর বুদ্ধি দোঁহাকার ;
অতুল আস্পদ ; দেহাশ্রিত গীতাসার ;
সকল বিভূতিযুত—সে হয় আমার
লোকনাথ, হ'ক তাঁর জয় জয় কার॥

বারদীর অন্যতম জমিদার ও জগন্নাথ কলেজের
ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ভক্তপ্রবর
শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল নাগ এম, এ, বিরচিত।

অবতরণিকা।

প্রবন্ধ মুখে ঐ যে উজ্জ্বল দিব্য শ্রীমূর্ত্তিটী দেখিতেছি, উহা কাহার মূর্ত্তি? তিনি কে?

তিনি **মূর্ত্তিমান্ গীতা ও জীবন্ত গীতা।** তিনি এক সময়ে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন "গুরু অনন্ত সাগরের ন্যায় অনন্ত রত্নের আধার। সাগর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন না, যে ডুবারু যত পারে তাহা হইতে রত্নরাশি কুড়াইয়া লয়; সাগর কাহাকেও নিষেধ করেন না।" যতই প্রবেশ করি, ততই ঐ অসীম সাগরে অনন্ত রত্নরাশি দেখিতে পাই। তাই বলি—

তিনি **গুরু।** তিনি **জ্ঞানস্বরূপ।** জ্ঞানদান করিয়া বহুলোকের অজ্ঞানতা নাশ করিয়াছেন। "**অজ্ঞান-ধ্বংসকং ব্রহ্মাগুরুরেব ন সংশয়ঃ।**" জ্ঞান কি? অজ্ঞান কি? বিদ্যা কি? অবিদ্যা কি? জীবে ব্রহ্মে প্রভেদ কি? ইত্যাদি বিষয় বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহার কৃপায় অনেকেই ব্রহ্মানন্দলাভের পথ পাইয়াছেন।

তিনি **প্রেমস্বরূপ**—প্রেম দান করিয়া তিনি বহুলোকের মন, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য, হরণ করিয়াছেন। তাই—

তাঁহার নাম **হরি।** যত লোকই ব্রহ্মচারিবাবার নিকট গিয়াছেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রত্যেকেই বলিয়াছেন, কেহ কেহ এখনও বলেন "ব্রহ্মচারিবাবা সর্ব্বাপেক্ষা

আমাকেই অধিক ভাল বাসিতেন।” তাঁহার উজ্জ্বল অনিমেষ নেত্র দুইটার দিকে যাঁহারা যেখানে থাকিয়া যুগপৎ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করিয়াছেন ব্রহ্মচারিবাবা আমাকেই সস্নেহনয়নে দর্শন করিতেছেন।

তিনি **ভবরোগের বৈদ্য**। তাঁহার নিকট যাইয়া বহুলোক ভবরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া নিত্যানন্দ ভোগ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ এখনও করিতেছেন। অনেকেই বিজ্বরতা লাভ করিয়াছেন এবং বহুলোক তাহা লাভ করিবার পথ পাইয়াছেন।

তিনি **শারীররোগেরও বৈদ্য**। প্রচলিত কথায় বলে “উদরী, বাদুড়ি, যক্ষা—এই তিন রোগে নাই রক্ষা।” ব্রহ্মচারিবাবার ইচ্ছামাত্র ঈদৃশরোগাক্রান্ত বহুরোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এইরূপ আরও কতপ্রকার উৎকটরোগাক্রান্ত রোগী যে তাঁহার নিকট যাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

তিনি **কল্পবৃক্ষ**। তাঁহার নিকট যাইয়া কখনই কেহ বিফল মনোরথ হয় নাই। যিনি যাহা চাহিয়াছেন, তিনি তাহাই পাইয়াছেন। জ্ঞানপ্রার্থী জ্ঞান পাইয়াছেন, প্রেমপ্রার্থী প্রেম পাইয়াছেন, বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র পাইয়াছেন, অন্ধব্যক্তি চক্ষু পাইয়াছেন, নির্ধন ধন পাইয়াছেন, ব্যাধিগ্রস্ত স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন এবং মানসরোগী শান্তি ও বিজ্বরতা লাভ করিয়াছেন। যাঁহার যে কোন বিষয়ে যে প্রকার সন্দেহ

থাকুক না কেন, তাঁহার নিকট যাইয়া সকলেই সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন।

তিনি "পণ্ডিত! আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" তিনি জীব মাত্রেরই ক্ষুধা তৃষ্ণায় আহুতি দিয়া ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। মৃত পার্ব্বতীচরণ রায় তাঁহার সময়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে একজন বড় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বহুকাল সুখ্যাতির সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন; অবশেষে বিলাতে যাইয়া একটী ইংরেজ মহিলারও পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া একদা বারদীর ব্রহ্মচারিবাবাকে দেখিতে যান; এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বোটানীর (উদ্ভিজ্জ-তত্ত্বের) একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মচারিবাবা সেই প্রশ্নের এমন সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া পার্ব্বতীবাবু আহ্লাদের সহিত বলিয়াছিলেন, "আপনার ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে আছে পূর্ব্বে জানিলে, আমি বিলাতে যাইতাম না।" অতঃপর পার্ব্বতীবাবু "From Hinduism to Hinduism" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের তাৎকালিক প্রধান নৈয়ায়িক স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয় ব্রহ্মচারিবাবার ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালদর্শী। তাঁহার নিকট যে সকল লোক যাইত, তিনি তাহাদের প্রত্যেকেরই মনের অভিপ্রায় ও প্রশ্ন জানিতে পারিতেন। যে কেহ যে কোন শাস্ত্রের কি বিষয়ের যে কোন প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রত্যেকেই তাঁহা হইতে তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছেন। পঁচিশ কি পঞ্চাশের বন্ধের ঘরে বাঁশ, বেত, খুঁটা ইত্যাদি কি পরিমাণ লাগিবে, তিনি তাহাও ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন।

পাঁচজন কি পাঁচশত লোককে খাওয়াইতে হইলে, কিম্বা উপনয়ন, বিবাহ, কি শ্রাদ্ধে, কোন জিনিষ কি পরিমাণে লাগিবে, তাহা ঠিক উপদেশ করিতেন। বিদ্যার্থী ও মোকদ্দমাকারিদিগকে তিনি যখন যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা তদনুরূপই ফল পাইয়াছে।

বনের ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ আকাশের মেঘও এই মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্মচারিবাবাকে বহুলোকেই একসময়ে বহুস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেখিতে পাইয়াছেন। এই বিষয় তাঁহার নিকট যাঁহারা যাঁহারা যাতায়াত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এবিষয়ে এস্থলে অনাবশ্যক ও বাহুল্য বোধে আর অধিক লেখা সঙ্গত মনে করিলাম না।

তাঁহাকে জানিবার, কি তাঁহার পরিচয় দিবার শক্তি বা অধিকার আমার নাই। তবে "জহরী জহর চিনে"; পূজ্যপাদ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন—"ইঁহার প্রতি রোমকূপে দেবতা; আমি ইঁহাকে ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়াছি।

তাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ ব্রাহ্মণের ন্যায় ইঁহার ত্রিসন্ধ্যায় মন্ত্রপাঠ করিবার প্রয়োজন হয় না।" অতএবই বলিতে পারি—

তাঁহার নাম **ব্রাহ্মণ**। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রণীত সিদ্ধজীবনীনামক গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে, ব্রহ্মচারিবাবার পরমভক্ত অন্যতম শিষ্য শ্রীমান্ মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, বি, এ, মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারিবাবা সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্য এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পদগৌরব ও প্রভাব যে অবতার হইতেও অধিক তাহা বিষদরূপে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, বারদীর মহাপুরুষ সেই '**ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ**' ছিলেন। ব্রহ্মচারিবাবা বলিয়া গিয়াছেন—'আমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে নামিয়া নিম্নভূমিতে আসিয়া একটী **ফুলের বাগান** প্রস্তুত করিয়া গেলাম। সময়ে এই বাগানে এক একটী ফুল ফুটিবে, আর ফুলের গন্ধে জগৎ আমোদিত হইবে।' তিনি মধ্যে মধ্যে শিষ্যদিগকে ইহাও বলিতেন—'একশত বৎসর পাহাড় পর্ব্বত বেড়াইয়া বড় **একটী ধন** কামাই করিয়া বসিয়াছি; তোরা ব'সে খাবি।' তাই মনে হইতেছে সেই বাগানের এক একটী ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং তাহার সৌরভ আস্তে আস্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে।"

বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারিবাবার উপদেশ।

ব্রহ্মচারিবাবা। যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, দেখিও যেন তাপ না লাগে।

প্রঃ। তাপ শব্দের অর্থ কি ?

উঃ। সুখে অথবা দুঃখে, জয়ে অথবা পরাজয়ে, মনের যে অবস্থা হয়, তাহার নাম "তাপ"।

প্রঃ। আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই করিব, এই কথা সত্য হইলে চুরি ও পরদার প্রভৃতি উৎকট পাপকার্য্যও আমি করিতে পারি ?

উঃ। তুমি তাহা করিতে পার না। করিতে চেস্টা করিয়া দেখিও, তুমি তাহা পরিবে না। জীব যতই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, ততই সমাজে যাহাকে নিকৃষ্ট কার্য্য বলে, সে সকল কার্য্য সে করিতে পারে না ; করিলে তাপ লাগে। কারণ যাহার যে কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে সে আর তাহা করিতে পারে না। তুমি এখন আর হাঁটুতে ভর দিয়া চলিতে পার না।

প্রঃ। পাপ কাহাকে বলে ?

উঃ। যাহাতে তাপ লাগে। সেই তাপ তোমার নিজেরও হইতে পারে অথবা তোমার সমাজেরও হইতে পারে। যে কার্য্যদ্বারা তুমি নিজে তাপগ্রস্ত হও, অথবা তোমার সমাজকে তাপগ্রস্ত কর, তাহাই পাপ কার্য্য।

প্রঃ। পাপকার্য্য করা কি কর্ত্তব্য ?

উঃ। কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্তিগত কথা। যাহা তোমার অকর্ত্তব্য তাহা অন্যের কর্ত্তব্য এবং যাহা অন্যের অকর্ত্তব্য তাহা তোমার কর্ত্তব্য।

প্রঃ। আমার মাথাবেদনায় আমি তাপগ্রস্ত হইলাম; মাথাব্যথাও কি পাপ হইল ?

উঃ। হাঁ।

প্রঃ। ইহাতে পাপ কোথায় আছে, বুঝিলাম না।

উঃ। মাথা কি ? কাহার মাথা ? বেদনা কি ? কে বেদনা বোধ করে ? ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে দেখিবে, 'অবিদ্যাতেই (মনে) বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। তবেই বুঝিতে পারিবে, যেখানে অবিদ্যা সেইখানেই পাপ এবং সেই খানেই তাপ। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানে পাপ তাপ থাকে না।

(যখন দেখিলাম ধন ও জনের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিন অবস্থাই তাপজনক, তখন যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—)

প্রঃ। তাপশূন্য ত, বাবা কোন কার্য্যই দেখি না ?

উঃ। ঠিক কথা, ইহা জানিয়া যে কার্য্য করে সেই মুক্ত। কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ বিনা কোন কার্য্যই হয় না। কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ ছাড়া ঈশ্বরও সৃষ্টি করেন না।

প্রঃ। ঈশ্বরও কিঞ্চিৎ তাপ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেন না, একথা বুঝিলাম না।

উঃ। অজ্ঞানতাই তাপের মূল কারণ। ঈশ্বরও অবিদ্যার

সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেন না। অতএব কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাপ সকল কার্য্যেই আছে।

প্রঃ। গুরু কে?

উঃ। ঠৈকা। যে, যে স্থানে ঠেকে, সে সেই স্থানেই শিক্ষা পায়। যাহার আদেশ তুমি অনুসরণ কর তিনিই তোমার গুরু।

প্রঃ। 'গুরুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে' ইহার অর্থ কি?

উঃ। গুরুর আদেশ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। গুরুর আদেশই গুরু।

প্রঃ। গুরুর আদেশ যদি গুরু হয়, তবে তাহার দেহকে আমি অনাদর করিতে পারি?

উঃ। না। গঙ্গাজলের পাত্রকেও লোকে আদর করে।

প্রঃ। 'গুরুর চরণ ধরিবে' ইহার অর্থ কি?

উঃ। গুরুর আচরণ ধরিবে, অর্থাৎ গুরু যে আচরণ করিয়া শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তদনুরূপ আচরণ করিবে।

"মহাজনের যেই পথ, তাতে হবে অনুগত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

প্রঃ। গুরুকে "আসন দিবে"— ইত্যাদি গুরুগীতার বাক্যগুলির অর্থ কি?

উঃ। গুরুকে "আসন দিবে" অর্থাৎ গুরুর আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিবে। "বসন দিবে" অর্থাৎ আচ্ছাদন দিবে—অভক্ত নাস্তিক প্রভৃতির নিকট তাঁহার আদেশ প্রকাশ করিবে না।

"বাহন দিবে" অর্থাৎ ভক্ত ও আস্তিক প্রভৃতির সহিত গুরুর উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। "ভূষণ দিবে" অর্থাৎ তাঁহার কৃতী শিষ্য হইবার জন্য যত্ন করিবে—কৃতী শিষ্যই গুরুর ভূষণ। "শয়ন দিবে" অর্থাৎ গুরুর আদেশ হৃদয়ে রাখিবে এবং ক্রমে উহা নিজের প্রকৃতিগত করিয়া লইবে।

প্রঃ। "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" ইত্যাদির অর্থ কি?

উঃ। গুরুর ন্যায় যোগ্য যে গুরুর পুত্র পৌত্রাদি তাহাদিগকেও গুরুর ন্যায় ভক্তি করিবে।

প্রঃ। গুরুর পুত্র কে?

উঃ। তাঁহার ঔরস পুত্র বা গুরুর উপদেশে যাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে।

প্রঃ। গুরুপুত্র মূর্খ হইলেও যদি আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি, তাহাতে দোষ কি?

উঃ। 'যদি' শব্দ সংশয়াত্মক। তুমি পার কিনা তাহা দেখ; না পারিলে লোক দেখান কার্য্য করিলে তাহাতে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইবে।

প্রঃ। গুরু শিষ্যের কি করেন?

উঃ। "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অর্থাৎ তিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানান্ধ মানবের চক্ষু উন্মীলিত করেন।

আমি কে? আমার কর্ম্ম কি? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি; কোথায় যাইব? গুরু কে? গুরুর সহিত আমার সম্বন্ধ কি? জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? সৃষ্টিকৌশল কি? এই সকল বিষয় গুরু শিষ্যকে বুঝাইয়া দিয়া সাধন পথে তাহাকে সাহায্য করেন।

ব্রহ্মচারিবাবা প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। তিনি বলিতেন তুমি যাহা অনুভব করিতে পার নাই, তাহা কাহাকেও বলিও না। তিনি 'গুরুর কার্য্য কি' ইহা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার আহারান্তে আমাকে ডাকিয়া নিয়া আমার সঙ্গে একপাত্রে আবার ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন; আমাকেও আহার করাইতেছেন, নিজেও আহার করিতেছেন। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনি! কি কার্য্য হইতেছে?" আমি বলিলাম—"আপনি আমার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছেন, আর আমি চিবাইয়া গলাধঃ করিতেছি।" তাহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"গুরু শিষ্যের এই পর্য্যন্তই করেন—মুখে উঠাইয়া দেন এই পর্য্যন্তই; শিষ্য নিজে চিবাইয়া উদরস্থ করিবে।"

প্রঃ। বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ, গুরুগীতা ভগবদ্গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র থাকা সত্ত্বে আবার গুরুর প্রয়োজন কি?

উঃ। শাস্ত্র জ্ঞানশিক্ষা দিতে পারে কিন্তু শাস্ত্র পাঠে বিজ্ঞান লাভ হয় না; অর্থাৎ যাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছে তিনি ভিন্ন শাস্ত্রের অর্থ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম, অন্যে বুঝিতে

পারে না। তুমি যেসকল শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিলে, মনোযোগ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক শাস্ত্রই সম্যক উপদেশ দিয়াও বলিয়াছেন—তুমি গুরুর নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ কর। যথা—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)

অর্থাৎ গুরুর পাদ বন্দনা করিয়া, তাঁহার আরাধনা করিয়া, এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া, সেই তত্ত্ব (ব্রহ্ম) জ্ঞাত হইবে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন। অপিচ—

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্।
(গুরুগীতা)

অর্থাৎ গুরু অপেক্ষা অধিক (শ্রেষ্ঠ) নাই। গুরু অপেক্ষা অধিক নাই! গুরু অপেক্ষা অধিক নাই! গুরুগীতা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিয়াছেন। অন্যচ্চ—

"যজ্ঞ-দান-তপো-ব্রত-জপ-তীর্থানুসেবনম্।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ॥"

অর্থাৎ গুরুতত্ত্ব (গুরু কি পদার্থ) তাহা না জানিয়া যজ্ঞ, দান, তপঃ, ব্রত, জপ ও তীর্থবাসের অনুশীলন করিলে, সে সমস্তই বিফল হয়, সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। গুরুর সাহায্যে সেই শাস্ত্রানুসারে চলিতে অভ্যাস করিতে হয়।

প্রঃ। গুরুগীতাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গুরুর ধ্যান লিখিবার কারণ কি?

উঃ। গুরু অনন্ত; তাঁহার মহিমা এবং মূর্ত্তিও অনন্ত। তন্মধ্যে গুরুগীতাতে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভাব ও কয়েকটী মাত্র মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। অধিকারভেদে যে যে ভাবে গুরুকে ধরিতে ও বুঝিতে পারিবে, সে সেইভাবেই ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে।

প্রঃ। আমার বন্ধনের ও মুক্তির কারণ কি?

উঃ। একই কারণ, যিনি তোমাকে বদ্ধ করেন, তিনিই আবার তোমাকে মুক্ত করেন। তিনি—দেবী ভগবতী মায়া।

"তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সাংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥" (চণ্ডী)

অর্থাৎ সেই ভগবতী মায়াদেবীই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আরাধনা করিয়া সেই দেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তিনি বরদাত্রী হইয়া অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া জীবকে মুক্ত করেন। তিনিই জীবের মুক্তির হেতু নিত্যা ও পরমাবিদ্যা। সংসারবন্ধনেরও তিনিই কারণ এবং তিনিই সমস্ত

ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী। তুমি ইহার সঙ্গে এই মহাবাক্যটীও স্মরণ রাখিবে। যথা—

"পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ-নিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থ-পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্ ॥"
(ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য)

অর্থাৎ জিহ্বা ও উপস্থ, এই দুয়ের কর্ম্মই তোমার কর্ম্ম। এই দুই কর্ম্মদেবতাকর্ত্তৃকই তুমি বদ্ধ। জিহ্বা ও উপস্থের কার্য্যত্যাগ হইলে তুমিও মুক্ত হও।

"নৈকস্মিন্ দ্বিভোজনম্" এই বাক্যের অর্থ তিনি এইরূপ করিতেন—একবার ক্ষুধাতে দুইবার ভোজন করিওনা, অর্থাৎ ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যে পরিমাণ ভোজন করা আবশ্যক, ততটা মাত্র আহার করিও, অতিরিক্ত আহার করিওনা। ক্ষুধা না হইলে অথবা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে, লোভে অথবা কাহারও অনুরোধে আহার করিও না। ক্ষুধা লাগিলেই আহার করিবে, ক্ষুধা হইলে অভুক্ত থাকিবে না। ক্ষুধার পূজা করিও, জিহ্বার অর্থাৎ লোভের পূজা করিও না।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।" (চণ্ডী)

অর্থাৎ সেই দেবী ভগবতী সর্ব্বপ্রাণীতেই ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন।

অপিচ—"তুমি আহার কর, মনে কর,
আহুতি দেই শ্যামা মাকে।" (রামপ্রসাদ)

প্রঃ। জিহ্বা ও উপস্থের কর্ম্ম নিবৃত্তির উপায় কি? এ সম্বন্ধে একজন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর উপভোগদ্বারা কামনার (বাসনার) নিবৃত্তি হয় না। অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি পাইলে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, বাসনাও তেমন উপভোগদ্বারা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অপর একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"নাঽভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম"

অর্থাৎ বিনা ভোগে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। এই দুই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়?

উঃ। প্রথম শাস্ত্রবচনে বলা হইয়াছে—"উপভোগেন" উপভোগদ্বারা; কিন্তু দ্বিতীয় শাস্ত্রবাক্যে উক্ত হইয়াছে "অভুক্তম্" অর্থাৎ ভোগবিনা; তবেই বুঝিতে হইবে—উপভোগদ্বারা কর্ম্ম (বাসনা) বৃদ্ধি পায়, ক্ষয় পায় না। কিন্তু ভোগদ্বারা ক্রমে কর্ম্মের ক্ষয় হয়। কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে জীব মুক্ত হয় না।

প্রঃ। ভোগে ও উপভোগে প্রভেদ কি?

উঃ। পতি ও উপপতি এই দুইয়ে যে প্রভেদ, পত্নী ও উপপত্নী এই দুইয়ে যে প্রভেদ; ভোগে ও উপভোগেও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ। বিচারপূর্ব্বক ভোগকে—"ভোগ", এবং অবিচারে ভোগকে—"উপভোগ" কহে। জিহ্বা ও উপস্থের ভোগের জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করা এবং প্রকৃতরূপে সম্যক্

ভোগ না করাও "উপভোগ"। যথা—সুখাদ্য জিনিষ খাওয়ার ইচ্ছায় নাড়াচাড়া করিলে, কিন্তু খাইলে না, ইহারও নাম "উপভোগ"। এই প্রকার উপভোগে, অথবা লোভের দাস হইয়া প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত পরিমাণে ভোগ করিলে, বহুমূত্র, অজীর্ণ, জ্বর ইত্যাদি নানাবিধ রোগ হয়। অতএব মুমুক্ষু আহার ও বিহার বিশেষ বিচারপূর্ব্বক করিবে।

প্রকৃতি দ্বিবিধা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যার পূজায় জীব মুক্ত হয়, অবিদ্যার পূজায় বদ্ধ হয়। অনেক সময়ে বিদ্যা ও অবিদ্যার সন্ধিস্থল (Line of demarcation) অর্থাৎ কোথায় যাইয়া উভয়ের অধিকার বা সীমা মিলিয়াছে, নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। যেমন উদ্ভিজ্জতত্ত্ব (Botany) ও জীবতত্ত্ব (Zoology) এই উভয়ের অধিকার কোথায় মিলিয়াছে নিশ্চয়রূপে দেখাইয়া দেওয়া কঠিন।

এইরূপ সন্ধিস্থলে সংশয় জন্মিলে ভক্তিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসু হইলে—

"অন্তর্য্যামিরূপে গুরু দিবেন জানাইয়া।"

অপিচ—"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অর্থাৎ অনাহার, ফলাহার ইত্যাদিদ্বারা ক্লিষ্টেন্দ্রিয় দেহীর বাসনার রসবোধহেতু ভোগেচ্ছা রহিয়া যায়। বাসনার মূলোৎপাটন করিতে এবং তাহাকে নিঃশেষ করিতে হইলে, এই

সকল কার্য্য করিতে করিতে আস্তিক্যবুদ্ধিদ্বারা বহির্মুখ দেহী ক্রমে অন্তর্মুখ হইয়া ব্রহ্ম, আত্মা অথবা ভগবানের দিকে চাহিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়।

"ভেকে বৈরাগ্য নাই বিনা উপদেশে।
সাধিলে সিদ্ধি নাই বিনা কৃপালেশে॥"

প্রঃ। আমি বদ্ধ অথবা মুক্ত, কিসে বুঝিব?

উঃ। তাপই তাহার পরীক্ষাস্থল। যখন তোমার কিছুতেই তাপ লাগিবেনা, সুখে বা দুঃখে, মানে বা অপমানে, শীতে বা গ্রীষ্মে, একই অবস্থায় থাকিবে, তখনই বুঝিবে তুমি "মুক্ত" হইয়াছ।

(ব্রহ্মচারিবাবার কখনও ঘর্ম্ম, হাঁচি, হাই অথবা দীর্ঘনিশ্বাস দেখি নাই।)

প্রঃ। তাপ লাগিবার কারণ কি?

উঃ। বাসনাই তাপের কারণ। যাহার বাসনা নাই তাহার তাপও নাই।

প্রঃ। যখন তাপভিন্ন কোন কার্য্যই নাই এবং বাসনাই যখন তাপের মূল, তখন তাপের মূল কারণ "সমস্ত কার্য্য ও স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদি" পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ গাছতলায় কি পাহাড়ে যাইয়া থাকাই ভাল।

উঃ। তাহা ভাল হইলেও তুমি তাহা পার কই? সাময়িক ভ্রমবশতঃ মনে করিতে পার তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে; কিন্তু ভিতরে যে তোমার বাসনা আছে, অন্ধতাপ্রযুক্ত তুমি তাহা

দেখিতে পাও না। বাসনা থাকিতে গাছতলায় গেলেও তোমার সন্ন্যাস হইবে না। এইমাত্র লাভ হইবে যে শাস্ত্রানুমোদিতা পরিণীতা স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া একটী সেবাদাসী গ্রহণ করিবে।

প্রঃ। সন্ন্যাস ভাল অবস্থা কি না ?

উঃ। ভাল অবস্থা।

প্রঃ। তবে প্রকারান্তরে গাছতলায় কি পাহাড়ে যাইতে নিষেধ করিলেন কেন ?

উঃ। সন্ন্যাস—মনের অবস্থা, তাহা যাহার হয় নাই, তাহার গাছতলায় কি পাহাড়ে গেলেও হইবে না। যাহার হইয়াছে তাহার গাছতলায় কি সংসারে থাকিলেও হইয়াছে। অতএব যাহার হইয়াছে, তাহার স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনাভাব। প্রয়োজন থাকিলে সন্ন্যাস হয় না, কারণ তাহার অভাববোধ রহিয়াছে।

প্রঃ। সন্ন্যাস কাহাকে বলে ?

উঃ। "কার্য্য পরিত্যাগ" এবং "কার্য্য করা" এই উভয়কে যে একই অবস্থা মনে করে, সেই সন্ন্যাসী। অলসতাপ্রযুক্ত কর্ম্মপরিত্যাগকে "সন্ন্যাস" বলে না।

প্রঃ। পূর্ব্বে বলিলেন, "পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনাভাব"; কিন্তু পরিবর্ত্তনে আপত্তিরই বা কারণ কি ?

উঃ। বিশেষ কোনও আপত্তির কারণ নাই। তবে যিনি ভয়ে অথবা কোনপ্রকার লোভে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন, তিনি নিকৃষ্ট লোক, সন্ন্যাসী হওয়া ত দূরের কথা।

প্রঃ। ভয়ে অথবা লোভে পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা কি অবস্থায় হয় ?

উঃ। এই সংসার ত্রিবিধ তাপে পূর্ণ। যথা—(১) বাক্যবাণ, (২) বিত্তবিচ্ছেদবাণ ও (৩) বন্ধুবিচ্ছেদবাণ। যিনি এই তিনটা বাণ (ত্রিবিধ তাপ) সহ্য করিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। অনেকে এই ত্রিবিধ তাপের ভয়ে অথবা মানসম্ভ্রমাদির লোভে পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা করেন। এই দ্বিবিধ লোকই মোহে অন্ধ। অতএব তাহাদের কাহারও সন্ন্যাস হয় নাই।

প্রঃ। বিত্তত্যাগ করিয়া গেলে আর বিত্তনাশের আশঙ্কা রহিল না। বন্ধুত্যাগ করিয়া গেলে আর বন্ধুবিয়োগের ভয় থাকে না। বনে চলিয়া গেলে আর বাক্যবাণেরও আশঙ্কা রহিল না। তবে তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি কি ?

উঃ। তাহাহইলে বনে যে পশু পাখী আছে তাহাতে আর তোমাতে প্রভেদ কি ?

প্রঃ। তবে কি আপনি এই সকল তাপের ভিতরে থাকাই কর্ত্তব্য মনে করেন ?

উঃ। হাঁ, মনে করি। কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ।

প্রঃ। ঐ সকল তাপের কি কোন উপকারিতা আছে ?

উঃ। প্রচুর উপকারিতা। প্রহ্লাদ ও সীতাকে দেখ।

প্রঃ। প্রহ্লাদ ও সীতার কথা কি বলিলেন বুঝিলাম না ?

উঃ। কেন ? অবতার কি উদ্দেশ্যে হয়, তাহাত বুঝ ?

ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষা করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এবং নিজে সেই ধর্ম্ম আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন।

প্রঃ। প্রহ্লাদের এবং সীতার সম্বন্ধে ত দেখিলাম তাহারা ভগবান্‌কে পাইতে যাইয়া কত উৎকট বিপদেই না পতিত হইলেন।

উঃ। হাঁ, তাহা সত্য। কিন্তু তাহারা ত কখনও নষ্ট হয় নাই।

প্রঃ। তবে প্রহ্লাদ সম্বন্ধে, কি সীতা সম্বন্ধে, আপনার কথিত বাক্যদ্বারা কি উপদেশ পাইলাম?

উঃ। অত উৎকট তাপও যখন সীতার অণুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারিল না, তখনই হরি তাহাকে কোলে নিলেন; তাহার পূর্ব্বে নেন নাই। অগ্নিপরীক্ষায় যখন সীতার অণুমাত্রও তাপ লাগে নাই, তখনই হরি সীতাকে গ্রহণ করিলেন; তাহার পূর্ব্বে গ্রহণ করেন নাই। তোমাদেরও যখন এইপ্রকার অবস্থা হইবে যে অবস্থায় কোনও তাপ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, তখনই হরি তোমাদিগকে কোলে নিবেন, তাহার পূর্ব্বে নিবেন না। অতএব তোমরা সংসার ছাড়িয়া যদি পশুর মত বনে যাইয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে সীতার ন্যায় তোমাদের পরীক্ষাও হইল না, হরিকে পাওয়াও ঘটিল না। অতএব সমাজে থাকিয়াই সাধন করিতে হইবে।

প্রঃ। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে বদ্ধাবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা?

উঃ। বদ্ধাবস্থাকে আমি শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলি নাই এবং

বদ্ধাবস্থা শ্রেষ্ঠ অবস্থাও নয়। তবে বদ্ধাবস্থা মুক্তাবস্থার সোপান। তোমার হাতে যদি বাঁধ না থাকে, তবে আমি কি খুলিয়া দিব? যদি তুমি মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার পূর্ব্বে বদ্ধ হইতে হইবে। বদ্ধ না হইলে মুক্ত হওয়ার কোনও অর্থ থাকে না।

(এইজন্যই মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত লোকস্থিতির অনুরোধে, আচার, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধানগুলি মানিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য। মুক্তাবস্থায় এইগুলি আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন আর সংসারের কোনও নাম গন্ধও থাকে না।)

প্রঃ। জীবের কি কি অবস্থা হয়?

উঃ। ত্রিবিধ অবস্থা; (১) মুক্তাবস্থা (২) বদ্ধাবস্থা ও (৩) মুক্তাবস্থা। জীবের প্রথম অবস্থায় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ইত্যাদি বন্ধন, কি সমাজ বন্ধন থাকে না। যথা—পশুজীবন ও পার্ব্বতীয় মনুষ্যদের জীবন। দ্বিতীয় অবস্থায় পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রাদির বন্ধন ও সমাজবন্ধন থাকে। যথা—তোমার ও হরিচরণ প্রভৃতির *। তৃতীয় অবস্থা আবার মুক্তাবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থায় কোন বন্ধনই থাকেনা। যথা—আমার ও ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতির।

* ৺হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা জজকোর্টের উকীল এবং ব্রহ্মচারিবাবার পরমভক্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিবাবার শ্রীমূর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া, তাঁহার রূপধ্যান ও নামজপ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। শুনিয়াছি মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

প্রঃ। প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় প্রভেদ কি?

উঃ। প্রথম অবস্থা—জ্ঞানের অভাব, মোহ ও অন্ধতায় পরিপূর্ণ। সে অবস্থায় জীব 'আমি কে? কেন আসিয়াছি? আমার কার্য্য কি?' ইত্যাদি কিছুই জানে না। তৃতীয় অবস্থা বিজ্ঞানের অবস্থা।

প্রঃ। দ্বিতীয় অবস্থার সহিত অন্য দুই অবস্থার প্রভেদ কি?

উঃ। দ্বিতীয় অবস্থা—মধ্যম অবস্থা। প্রথম অবস্থার ন্যায় অজ্ঞানের অবস্থাও নয়, তৃতীয় অবস্থার ন্যায় বিজ্ঞানের অবস্থাও নয়। যে কথঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানদ্বারাই বিচার-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ। আমাকে দ্বিতীয় অবস্থার এবং আপনাকে তৃতীয় অবস্থার লোক বলিলেন; আপনার ও আমার কার্য্যে প্রভেদ কি?

উঃ। এই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আমার এখানে আসিয়া যদি আমার কার্য্য না দেখ এবং তাহার সহিত তোমার নিজের কার্য্যের তুলনা না কর, তবে এখানে আসা নিষ্প্রয়োজন। আমার এখানেও কয়েকটী লোক আহার করে, তোমার বাসায়ও কয়েকটী লোক আহার করে। আমার এখানে যাহারা আহার করে, তাহাদের খাইবার জিনিষ কোথা হইতে আসিবে, তাহারা কি খাইবে, তৎসম্বন্ধে আমার কোন চেষ্টা কি ভাবনা নাই; তোমার চেষ্টা ও ভাবনা আছে। বিশেষ, তুমি এই মনে কর, যে তুমিই তাহাদিগকে খাইতে দাও।

প্রঃ। আপনার চেষ্টা অথবা ভাবনা নাই কেন ? এবং আমারই বা চেষ্টা অথবা ভাবনা থাকে কেন ?

উঃ। আমি জ্ঞানী, তুমি অজ্ঞান। আমি জানি আমি কাহাকেও খাইতে দেই না। যাহার এখানে আহার্য্য আছে সে আহার করে, যাহার নাই সে আহার করে না ; তাহাতে আমার কোনও তাপ নাই। তোমার মনে এই ভয় আছে যে তুমি খাইতে দিতে না পারিলে সমাজের লোক তোমাকে নিন্দা করিবে। আমার সে ভয় নাই।

প্রঃ। **ধর্ম্ম** কাহাকে বলে ? শাস্ত্রের মতে কিন্তু বেদ-বিহিত কার্য্যই "ধর্ম্ম" এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মই "অধর্ম্ম" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উঃ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের যে কাজ তাহাই **ধর্ম্ম**। অতএব যাহার যে গুণ তাহা অতিক্রম করিয়া ভ্রমবশতঃ যে যে কোন কার্য্য করে তাহাই তাহার পক্ষে **অধর্ম্ম**। ভগবান্ রজোগুণান্বিত ক্ষত্রকুলজ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ", অহিংসা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম (ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম) হইলেও তাহা তাঁহাকে করিতে দিলেন না।

প্রঃ। আপনার মতে ও শাস্ত্রমতে কি কোনও প্রভেদ আছে ?

উঃ। কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে শাস্ত্র মুক্তপুরুষের লেখা, বদ্ধজীব তাহা বুঝিতে অক্ষম, তাই তোমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যই প্রকারান্তরে উল্লেখ করিলাম। আমি

"ধর্ম্ম" শব্দের যে ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা মনে রাখিয়া শাস্ত্র পড়, দেখিবে আমার ব্যাখ্যার সহিত শাস্ত্রের কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। যথা—বীরাচার সাধক ছাগাদি বলি দিয়া কালীপূজা করে, পক্ষান্তরে, পশ্বাচারী সাধক ছাগাদি বলি না দিয়া কেবল নৈবেদ্যাদি দিয়াই সেই কালীরই পূজা করে। সাধকের গুণভেদে আচারভেদ মাত্র।

প্রঃ। তবে কি আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিব যে আমার যে গুণ আমি সেই প্রকার সাধনই করিব?

উঃ। তুমি জান কি না জান, তোমার যে গুণ সেই প্রকার কার্য্যই তুমি করিতেছ এবং তোমার কার্য্যই তোমার 'সাধন'। তবে অর্জ্জুনের যেমন মোহবশতঃ "যুদ্ধ করিব না" প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ মোহবশতঃ বনে যাইয়া সন্ন্যাসী হইবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলে, তোমার সেই মোহ ও অজ্ঞানতা দেখাইয়া দিয়া আমি তোমাকে সংসারে নিযুক্ত করিয়াছি। তোমাকে সংসারে থাকিয়াই সন্ন্যাসী হইতে হইবে।

প্রঃ। আমার কি গুণ, আমার কি কর্ম্ম, আমি তাহা কি উপায়ে নির্দ্ধারণ করিব?

উঃ। গভীর রাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিয়া দেখিও, তোমার মন কোন্ দিকে যায়; তোমার মন পুনঃ পুনঃ নিবারণ করা সত্ত্বেও যে দিকে যাইতেছে তাহাই তোমার স্বকর্ম্ম; এবং সেই সময় ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিও তুমি

সমস্তদিন যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহা সত্ত্বপ্রধান, কি রজঃপ্রধান, কি তমঃপ্রধান। তোমার অধিকাংশ কার্য্য যে গুণের, তুমি সেই গুণবিশিষ্ট বট।

প্রঃ। সত্ত্বগুণের লক্ষণ কি?

উঃ। প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণই সত্ত্ব গুণের লক্ষণ; অর্থাৎ শম, দম, তপঃ, শৌচ ইত্যাদি।

প্রঃ। রজোগুণের লক্ষণ কি?

উঃ। দান, ঐশ্বর্য্য, বীরত্ব ইত্যাদি।

প্রঃ। তমোগুণের লক্ষণ কি?

উঃ। হিংসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি।

প্রঃ। এই সমস্ত গুণ ও কার্য্য প্রত্যহ চিন্তা করিলে আমার কি লাভ হইবে?

উঃ। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার থাকে না; গৃহস্থ জাগিলে যেমন চোর পলায়ন করে; সেই প্রকার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তির কার্য্যসমূহ দিন দিন পলায়ন করিবে, তোমার দেহ একটী দেবমন্দির হইবে, ব্রহ্মশক্তি তোমার হৃদয়কে অধিকার করিবে এবং তুমি ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে।

প্রঃ। পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্য কি?

উঃ। যে দিন পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে, সেই দিন ইহার উত্তর পাইবে; আমার বলিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। গুরু শিষ্যকে অসার খোদিতে বলেন, সারের কথা অগ্রে

বলিয়া দেন না; বলিয়া দিলে তাহা কল্পনাতে পরিণত হয়, প্রকৃত তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

প্রঃ। অসার কি? সার কি? অসার খোদিতে বলিবার কারণ কি?

উঃ। অসার ক্ষণকালস্থায়ী, সার চিরকালস্থায়ী। তোমার দেহ ও মন অসার, তোমার আত্মা সার। তোমার দেহ ও মন মায়াতে গঠিত, অতএব মায়ার অধীন। তোমার আত্মা মায়ার অতীত। অসার খোদিতে বলিবার কারণ এই যে, তোমার এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন উপকরণ নাই, যদ্দারা তুমি হরিকে (আত্মাকে) পাইতে পার, কি হরির সাধন করিতে পার। মায়ামুগ্ধাবস্থায় মায়ামুক্ত ভগবানের কোনও প্রকার অনুভূতি হয় না। যতপ্রকার সাধনপ্রণালী দেখ, সাধক জানে কি না জানে, সকলেরই লক্ষ্য—দেহ ও মনের সাধন; দেহ ও মনকে পবিত্র করা, দেহ ও মনকে শুদ্ধ করা। সকলপ্রকার সাধনেরই মূলভিত্তি এক।

প্রঃ। দেহ ও মনকে পবিত্র করিবার কি কোন বিশেষ উপায় আছে?

উঃ। আছে; সাত্ত্বিক আহারে দেহ পবিত্র হয় এবং বাসনাত্যাগেতে মন পবিত্র হয়। যখন তোমার দেহ ও মন পবিত্র হইবে, তখন বুঝিবে হরি কেমন, তখন জানিবে হরি তোমার কে।

প্রঃ। ব্রহ্মশক্তি আমার হৃদয়কে অধিকার করিবে ইহার অর্থ কি?

উঃ। কেন? মহাষ্টমীর দিন যে কালীপূজা হয়, সেই কালীমূর্ত্তি কি কোন দিন দেখ নাই?

প্রঃ। দেখিয়াছি, তাহাতে কি বুঝিলাম?

উঃ। সেই কালীই **ব্রহ্মশক্তি**; তিনি **শবের** হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

প্রঃ। শব কে?

উঃ। তুমি যাহাকে **শিব** বলিয়া জান।

প্রঃ। শব ত মৃতদেহকে বলে।

উঃ। তাই শিবকে "শব" বলে।

প্রঃ। শিব—মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহাকে "শব" বলে কেন? বুঝিলাম না।

উঃ। যে কারণে শিব মৃত্যুঞ্জয়, সেই কারণেই শিব—শব।

প্রঃ। সেই কারণ কি?

উঃ। **বাসনা ত্যাগ**। বাসনাত্যাগ হইলেই জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার আর মৃত্যু থাকে না। ঘটের নাশই মৃত্যু; যাহার দেহে আত্মবুদ্ধি নাই, তাহার আবার মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? অভিমান না থাকাতে কোন কার্য্যই তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্বে হইয়াছে বলিয়া তিনি বোধ করেন না। এই অবস্থায় তিনি সংসারের সকল কার্য্যই করিতে থাকেন, অথচ কিছুই করেন না। ভোগবাসনার অভাবে জীব মৃতবৎ সংসারে বিচরণ করেন। জীব যখনই বাসনাশূন্য হয়, তখনই তাহার জীবত্ব শেষ হইয়া যায় এবং তিনি শিবত্ব লাভ করেন অর্থাৎ

তাহার জীবভাব ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। সেই অবস্থায় ইচ্ছাময়ী ব্রহ্মশক্তি (কালী) তদীয় শবদেহ অধিকার করিয়া বসেন, এবং সেই শবশরীর আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকেন। এইরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের শক্তি ও গুণসম্পন্ন হইয়া শব, শিব নামে কথিত হয়েন।

প্রঃ। তবে কি আমার বাসনাত্যাগ হইলে আমার হৃদয়ে কালীমূর্ত্তির ন্যায় চতুর্ভূজা লোলজিহ্বা এক মূর্ত্তি দণ্ডায়মান্ থাকিবে ?

উঃ। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্।" ইহা ত জান ?

প্রঃ। হাঁ জানি, তাহাতে কি হইল ?

উঃ। তোমার হিতের জন্য, তোমাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ঐ মূর্ত্তি। তোমার বাসনাত্যাগ হইলে যে ব্রহ্মশক্তি তোমার হৃদয়কে যুগে যুগে অধিকার করিবেন তিনিই কালী এবং তিনিই জ্ঞানস্বরূপা, "আত্মারামের আত্মাই কালী"। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ঃ—

কে জানে গো কালী কেমন ?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।

কালী পদ্মবনে, হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ,
তাঁরে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবেরই মতন,
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন,
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কি আর
জানে তেমন ?
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন,
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা, ধরবে শশী হয়ে
বামন।

আবার রামদুলাল মুন্সী গাহিয়াছেন,—

জানি গো জানি গো তারা, তুমি যেন ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হওমা রাজি।
মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা;
আল্লা বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান ছৈয়দ কাজি।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শাক্ত বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি;
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা'জী।
শ্রীরামদুলালে বলে, বাজি নয় এ যেন ফলে,
একব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি॥

প্রঃ। সাধক কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বিভক্ত ?

উঃ। সকল প্রকার সাধকই কর্ম্মী, তবে শাস্ত্রকারেরা সাধকদিগকে প্রধানতঃ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) জ্ঞানী, (২) যোগী, (৩) ভক্ত, (৪) কর্ম্মী। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বলেন—ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা বলেন—ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ দেবতা প্রভৃতি। যাঁহারা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা বলেন—কর্ম্মই ব্রহ্ম। যোগীরা বলেন—আত্মাই ব্রহ্ম।

প্রঃ। এই চারিশ্রেণীর সাধনপ্রণালীর কি কোনও প্রভেদ আছে?

উঃ। আছে। জ্ঞানীর সাধন—সৎসঙ্গ, দান, বিচার (নিত্যানিত্যবিবেক) ও সন্তোষ। যোগীর সাধন—জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত যোগকরা অথবা কুণ্ডলিনীশক্তিকে পরমশিবেতে লীনকরা, অথবা রাধাকৃষ্ণের মিলন করা। ভক্তের সাধন—ভগবানের আত্মবৎ সেবা এবং পূজা করা। কর্ম্মযোগীর সাধন—দান, যজ্ঞ ও সাংসারিক কাজকর্ম্ম অনাসক্তভাবে করা। তোমাকে এই চতুর্ব্বিধ সাধন প্রণালী বলিলাম বটে, কিন্তু সকলপ্রকার সাধকই বিচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে বাসনাশূন্য হইয়া "মুক্ত" হয়।

প্রঃ। সৎসঙ্গের ফল কি?

উঃ। "গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পদ্রুমো হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"
"তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি দর্শনাদেব সাধবঃ।"

সাধুসঙ্গের অনন্ত মহিমা এবং অনন্তগুণ।

প্রঃ। দানের উপকারিতা কি ?

উঃ। দানে উদারতা ও বৈরাগ্য আনিয়া দেয়।

প্রঃ। বিচারে লাভ কি ?

উঃ। আত্মানাত্মবোধ হয়। নিত্যানিত্যবিবেক জন্মিলে বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয় এবং জীব শিব হইয়া যায়।

প্রঃ। সন্তোষ কি প্রকারে সাধন করিতে হয় ?

উঃ। সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও সর্ব্বদা মনের সন্তোষরক্ষা করার চেষ্টাকরা।

প্রঃ। ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, এই স্থানে "যুগ" শব্দের অর্থ কি ?

উঃ। কোন এক কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষপর্য্যন্ত যে সময় তাহারই নাম "একযুগ"। অতএব যুগে যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে; অথবা বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে বুঝিতে হইবে। ইহার আরও এক অর্থ একই জীবের দুই তিন বারের জন্ম নিয়াও হইতে পারে। তুমি 'যুগে যুগে' শব্দের অর্থ 'সময়ে সময়ে' বলিয়া বুঝ। তাহা হইলেই তুমি সকলই বুঝিতে পারিবে।

প্রঃ। আপনার এই বিবিধ প্রকারের অর্থ আমি বুঝিলাম না। ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষার জন্য কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদিরূপে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বরং বুঝিলাম। কিন্তু বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্য ইহার প্রত্যেক সময়ে একজনের একজীবনে ভগবান্ তিন চারিবার কি প্রকারে অবতীর্ণ

হন, বুঝিলাম না ; এবং একই জীবের দুই তিন জন্ম নিয়াও কিপ্রকারে ভগবান্ একবার অবতীর্ণ হন, তাহাও বুঝিলাম না।

উঃ। অবতারের অন্যতম উদ্দেশ্য অসুর নিপাত করা। তোমার হৃদয়ে জ্ঞানরূপ ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তোমার অধর্ম্মরূপ অজ্ঞানরূপ অসুরকে যুগে যুগে বিনষ্ট করেন ; অতএব অধর্ম্মরূপ অসুর তোমার জ্ঞানের অবতরণে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকারে একজনের জীবনে ভগবান্ পাঁচ সাত বারও অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন একব্যক্তি মদ খাওয়া ও চুরি করা এই দুইটী পাপকার্য্যে লিপ্ত আছে। কতদিন মদ খাওয়ার পর মদ খাওয়া যে মুহূর্ত্তে তাহার পাপ বলিয়া বোধ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করিল এবং চৌর্য্যবৃত্তিকেও যখন পাপ বলিয়া বোধ হইল, তখনই সে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। এই প্রকারে একজনের হৃদয়ে ভগবান্ বহুবার অবতীর্ণ হন। পক্ষান্তরে এক জীবের বহুবারের জন্ম নিয়াও ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে পারেন।

প্রঃ। একবার যাহার হৃদয়ে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন, সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যায়না কেন ?

উঃ। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ একবারেই জীবকে মুক্তি করিয়া দিলে ভগবানের সৃষ্টিকৌশলও থাকে না।

প্রঃ। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী ; অতএব আমার হৃদয়ে তিনি সর্ব্বদাই আছেন, আবার “অবতীর্ণ হইলেন” ইহার অর্থ কি ?

উঃ। তুমি যখন তাঁহাকে তোমার হৃদয়ে দেখ এবং আছে বলিয়া উপলব্ধি কর, তখনই তিনি "অবতীর্ণ হইলেন" বলিয় লোকে বলে।

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে? শ্যামা!
তুমি পাষাণময়ী বিষম মায়া কত কাচ কাচাই কাচ॥
উপাসনাভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ,
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথায় বাঁচ॥
বারে বারে যাতাযাত, পুত্রদারাসমন্বিত,
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভোলে পেয়ে কাচ
প্রসাদ বলে মম হৃদে অমল কমল ছাঁচ,
সেই ছাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥"

প্রঃ। প্রারব্ধ কর্ম্ম কাহাকে বলে?

উঃ। শাস্ত্রকারেরা বাণের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করিয়াছেন। বাণ যেমন ধনু হইতে ছাড়িয়া দিলে কর্ত্তার আর তাহার উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব থাকেনা, বাণ আপন গতিতে যেখানে ইচ্ছা যাইয়া পতিত হয়, জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মও তদ্রূপ।

প্রঃ। ইহাতেও বুঝিলাম না।

উঃ। ছোটবেলা পড়িয়াছ---

"ললাটে লিখিতং যত্তু ষষ্ঠীজাগরবাসরে।

ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা চান্যথা কর্ত্তুমর্হতি॥"

এই শ্লোকের অর্থ যদি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পার, তবেই "প্রারব্ধ" উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। "ষষ্ঠী" শব্দের অর্থ ছয়ের সমষ্টি। বিচ্ছিন্নভাবে নহে, একীকৃত অবস্থায় জাগরবাসরে—জাগ্রত অবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় (সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থায়)। এখন এই শ্লোকের অর্থ হইল--- সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থায় যখন সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, অনন্ত ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞানরূপে একমাত্র থাকিয়া "একোঽহং বহু স্যাম্‌" "আমি এক আছি, বহু হইব" বলিয়া সঙ্কল্প করাতে যাহা হইতে সৃষ্টি হইল, তখন যাহার ললাটে যাহা লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে যে কর্ম্ম নির্দ্দিস্ট হইয়াছে, হরি, হর বা ব্রহ্মাও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। কারণ হরি, হর ও ব্রহ্মাও সেই সঙ্কল্পের অধীন। এই সঙ্কল্পই—প্রারব্ধ। অতএব ভগবান একজনের জীবনে জ্ঞাতস্বরূপে বহুবার অবতীর্ণ হইলেও, সেই সঙ্কল্পের অধীন থাকায় জীব মুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে একবারেও মুক্ত হইতে পারে।

প্রঃ। মালসীগান, হরিসংকীর্ত্তন, জপ ও ধ্যানে আনন্দ পাই কেন?

উঃ। তখন তোমার জিহ্বা কি উপস্থের কার্য্য বা চিন্তা থাকে না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন—

"যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনে ক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচার মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

ব্রহ্মচারিবাবা সমাজের প্রচলিত প্রথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন। তিনি বলিতেন—অধিকারিভেদে ক্ষেত্রব্রত হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যাপূজা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি নিজে কোন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্র দিয়াছেন, কোনও গরীব ব্রাহ্মণ পুত্রের যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া দিয়াছেন, কোন কোন ব্যক্তিকে ফুল দুর্ব্বাদ্বারা পূজা করাইয়াছেন। শিবপূজা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও হরিপূজা ইত্যাদি এবং পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম্মকে তিনি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন এবং বলিতেন ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই বিশেষ উপকার আছে।

ব্রহ্মচারিবাবা প্রসঙ্গতঃ এই তিনটী উপদেশও দিয়াছিলেন—

১। গরজ করিবে, আহম্মক হইবে না।

২। ক্রোধ করিবে, অন্ধ হইবে না।

৩। পাতা কাটিয়া ভাত খাইবে, বাসন করিবে না। ইহা গৃহস্থের জন্য ব্যবস্থা নহে।

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

সাধারণ অর্থ ঃ—শিষ্যের অর্থ-নাশকরী গুরু বহু পাওয়া যায় কিন্তু শিষ্যের ভবদুঃখনাশক গুরু অতীব দুর্লভ।

এই অর্থ গ্রহণ করিলে এই শ্লোকস্থিত বহু গুরুদের প্রতি একটা ঘৃণার ভাবই আসে, ভক্তির ভাব আসে না। তাই ব্রহ্মচারিবাবা ইহার নিম্নলিখিত অর্থ আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন "তত্ত্বনির্ণয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য, তোদের ৬ষ্ঠী বা ৭মী বিভক্তিদ্বারা আমরা বাধ্য নহি। এই শ্লোকে 'বিত্ত' শব্দের অর্থ 'চিত্তবৃত্তি'। জীবের অন্তঃকরণে যে সকল বৃত্তি থাকে তাহা বাহিরে সাকারিত হইলেই বিত্ত শব্দ বাচ্য হয়। সুতরাং অন্তরে যাহা চিত্তবৃত্তি ছিল বাহিরে তাহাই জীবের বিত্ত হইল। এই অন্তরস্থ চিত্তবৃত্তি না থাকিলে বাহিরে জীবের কোন বিত্তই থাকিতে পারে না। এই চিত্তবৃত্তির অনুকূল বা প্রতিকূল যে সকল বস্তু কি জীব দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রত্যেকেই জীবের গুরুরূপে কার্য্য করে; অর্থাৎ জীবকে ভোগ বা ত্যাগ করাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর করাইয়া দেয় এবং সন্তাপহারক গুরুর নিকট যাইবার উপযোগী করিয়া তোলে। সন্তাপহারক গুরু, আমাতে যে তাপ নাই, তাপ যে একটা কাল্পনিক জিনিষ, তাপের যে প্রকৃতই অস্তিত্ব নাই, ইহা যে অবিদ্যাজনিত, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত ভ্রান্তিমাত্র এই জ্ঞানদান করিয়া সন্তাপহারক গুরু তাহা সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশের মত নাশ করিয়া ফেলেন। সেই দুর্লভ গুরু, লোকনাথের ন্যায় গুরু, প্রতি ঘরে ঘরে কেন প্রতি শতাব্দিতেও সর্ব্বদা ঘটেনা, কোটীতে

গুটী পাওয়াও দুষ্কর। তিনি আরও বলিতেন তোমার পিতা এবং পিতৃস্থানীয় পুরুষেরা এবং মাতা এবং মাতৃস্থানীয়া পিসীমাতা ও মাসীমাতা প্রভৃতি সকলেই তোমার গুরু এবং আমিও তোমার গুরু। মাতা সন্তানকে বলিতেছেন—"আরও একটু মিস্টান্ন আহার কর" এই কার্য্যদ্বারা তিনি তোমাকে ভোগ করাইতেছেন। পিতা বলিতেছেন—"অধিক আহার করিও না। কারণ তাহা হইলে তোমার অসুখ হইবে।" ইহাদ্বারা তিনি ত্যাগের পথে নিতেছেন। আর আমি তোমাকে বলিতেছি "যামিনি, তোমার ভোগও নাই ত্যাগও নাই, তুমি ভোগীও নও, ত্যাগীও নও। তুমি নির্বিকার নির্গুণ সেই পরম পুরাতন পুরুষ; তুমি সর্ব্বদাই আনন্দময়, তোমাতে তাপের লেশমাত্রও নাই।" ধন্য আমার পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যবল। একমাত্র তাঁহাদের পুণ্যের ফলেই আমি এই প্রকার গুরুর কৃপালাভ করিতে পারিয়াছি।

উপসংহার

আমার সহিত কথাপ্রসঙ্গে পরম কারুণিক ব্রহ্মচারিবাবা স্বয়ং অথবা আমার প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে কয়েকটী মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাধকদিগের সাধনপথে উহা কথঞ্চিৎ সাহায্যকারী হইতে পারিবে এই বিশ্বাসে আমি সেই সকল উপদেশ, যতদূর স্মরণ হইয়াছে, যথাযথ এস্থানে উপন্যস্ত করিলাম। অতঃপর আমাদের সতীর্থদিগের মধ্যে পরস্পর আলাপপরম্পরায় যে

কয়েকটী সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ লইয়া সময়ে সময়ে সংশয়, বিতর্ক ও মতভেদ উপস্থিত হইত এবং যে সম্বন্ধে সংশয় ও মতভেদ অপরের মধ্যেও সর্ব্বদা সংঘটিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেই সকল শব্দের নিঃসন্দেহ ও প্রকৃত অর্থ শাস্ত্রানুসন্ধানপূর্ব্বক যতদূর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাও এস্থলে নিম্নে প্রকটিত হইল।

যোগ, চিত্ত ও হৃদয় শব্দের প্রকৃত শাস্ত্রীয় অর্থ এবং শেষোক্ত শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থভেদ লইয়া প্রায়ই সাধকসমাজে বিতর্ক ও আলোচনা হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিয়া, এসম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ভগবান বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে যে উপদেশ করিয়াছেন, সমধিক প্রামাণিক বোধে সেই অর্থই এস্থলে উল্লিখিত হইল।—

চিত্ত—অন্তরে প্রাণের অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ুর স্পন্দন হইয়া সংসার ভাবোন্মুখী যে চিতি শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকেই চিত্ত বলে।

হৃদয়—হৃদয় দুইপ্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটী 'হেয়' ও অপর একটী 'উপাদেয়'। দেহাত্মবাদীদের মতে বক্ষঃ ও পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থলে হৃদয় নামে যে স্থান আছে তাহাকেই 'হেয়' বলে। জ্ঞানমাত্র যে হৃদয়, তাহাকেই জ্ঞানীগণ 'উপাদেয়' সংজ্ঞা প্রদান করেন। এই উপাদেয় হৃদয়ই অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা বিদ্যমান; অথচ আবার কোথাও অবস্থিত নহে। উহাই 'প্রধান' হৃদয়। উহাতেই এই নিখিল বিশ্ব অবস্থান করিতেছে।

উহা সমস্ত পদার্থের দর্পণস্বরূপ, সকল সম্পদের কোষাগার এবং সমস্ত জীবের চিন্ময় জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। উহা দেহীর দেহের কোনও অবয়ব বা কোনও অবয়বের অংশ নহে।

যোগ—চিত্ত ও তদীয় স্পন্দন, এই উভয়ই নিত্য এবং অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। ইহাদের একতরের ধ্বংস হইলে, অপরের অর্থাৎ গুণী ও গুণ উভয়েরই বিনাশ হইয়া থাকে।

যোগ ও জ্ঞান এই দুইটী ক্রমান্বয়ে চিত্তনাশের প্রধান উপায়। চিত্তের ব্যাপার নিরোধকে "যোগ" এবং বস্তুর অর্থাৎ তত্ত্বের সম্যক দর্শনকে 'জ্ঞান' বলে। শাস্ত্রে 'বস্তু' শব্দে আত্মাকে বুঝায়। তদ্ভিন্ন পদার্থকে অবস্তু কহে।

প্রাণ সম্যক্ রুদ্ধ হইলেই মনের (চিত্তের) ও নিরোধ ঘটে। যে যে উপায়ে প্রাণকে নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

শাস্ত্রালোচনা, সজ্জনসংসর্গ ও বৈরাগ্যের অনুশীলনদ্বারা ক্রমে সংসারবৃত্তান্তে অনাস্থা জন্মিলে, একাগ্রতালক্ষণ অভীষ্ট বস্তু-ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ দীর্ঘকাল ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতে থাকিলেই প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

ঐকান্তিক ধ্যানযোগ অভ্যাস করিলেও প্রাণের স্পন্দন বিনষ্ট হয়। পূরক, কুম্ভক ও রেচকাদি নিরন্তর অভ্যাস করিলেও প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

অ উ ম্ দ্বারা যে প্রণব অর্থাৎ **ওঁঙ্কারের** উৎপত্তি হয়, তাহার সুদীর্ঘ উচ্চারণের অবসানে ঐ শব্দের স্বরূপের

উপলব্ধি হইয়া থাকে। এবং সেই কালেই বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানের উপরতি হয়। ইহাতেও প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে।

বারংবার রেচকের অনুশীলন করিলেও প্রাণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যাকাশে উপনীত হয়, তখন আর সে নাসাবিবরকে স্পর্শ করে না। ইহাতেও প্রাণ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

কেবল পূরকের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারাও প্রাণের নিরোধ ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ কেবল কুম্ভকের বারংবার অভ্যাসেও প্রাণের নিরোধ হইয়া থাকে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে শেষোক্ত চারিটীর অনুশীলন করিলেও যোগে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, সাধকের নিম্নলিখিত অবস্থা ঘটে।

চক্ষুঃ স্থিরং যস্য বিনাবলোকনম্,
প্রাণঃ স্থিরং যস্য বিনা নিরোধনম্,
মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনম্।

"তখন যোগীর, অবলোকন ব্যতিরেকেও, চক্ষুঃ স্থির হয়; বায়ুরোধের যত্ন ব্যতিরেকেও প্রাণবায়ু স্থিরত্ব লাভ করে; এবং আশ্রয় বিনাও চিত্ত নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

যোগীর এইরূপ অবস্থার কথা যাহা শুনিয়াছি, আমি যতদূর দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে ব্রহ্মচারিবাবার ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারি।

এখানে আমরা আমাদের সাধক ভ্রাতাদের হিতের জন্য আর দুই একটী কথা না বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে চাহি না।

যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এরূপ মহাপুরুষের সাহায্য ও উপদেশ না পাইয়া যোগাভ্যাস করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।

বৈরাগ্যকে মূলভিত্তি না করিয়া যাঁহারা যোগবলে বলবান্ হইতে যান, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক সংসারে অনিষ্ট সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা যত অধিক, ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা তত নহে। কারণ, তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির এবং রজঃ ও তমোগুণের অধীন থাকা বশতঃ আসক্তি ত্যাগে সমর্থ হন না এবং স্বার্থপর হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারিবাবার জীবন বৃত্তান্ত।

'ধৰ্ম্মসার-সংগ্রহ' নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যে সকল মহামূল্য উপদেশপরম্পরা প্রকাশিত হইল, আমার মতে কি ধর্ম্ম, কি তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে, এরূপ সারবান্ উপদেশ অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। বহুকাল হইতেই আমার মধ্যে এমন একটা রোগ ঢুকিয়াছিল, যে অমুক স্থানে অমুক সন্ন্যাসী কি মহাপুরুষ আসিয়াছেন, অমুক গ্রামে অমুক ফকীর বা দরবেশ বাস করিতেছেন, অমুক নগরে অমুক শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধক পুরুষ আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিলেই অমনি ব্যগ্র

হইয়া তাঁহার চরণদর্শনে বহির্গত হইতাম। দূরবর্ত্তী স্থান হইলেও গমনক্লেশ ও অন্য সর্ব্ববিধ অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া, তথায় চলিয়া যাইতাম। এই রোগের বশীভূত হইয়া আমি এযাবৎ বহুল মহাজন ও গুরুব্যক্তির চরণ সেবা করিয়াছি! কিন্তু অবশেষে জন্মান্তরীণ বহু পুণ্যবলে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চরণে শরণ লাভ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে ও তাঁহার অমূল্য উপদেশপরম্পরা শ্রবণে, হৃদয়ে যে অসামান্য আলোক ও অনির্ব্বচনীয় শান্তি লাভ করিয়াছি, সেরূপ আর কুত্রাপি যাইয়া লাভ করিব বলিয়া আশাও করিনা এবং অন্যত্র যাইয়া আর উপদেশগ্রহণের স্পৃহাও রাখি না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি কীদৃশ সারবান্ ও মূল্যবান্, তাহা বোধ হয় ধর্ম্ম ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকসমাজে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ পাঠ করিয়া আপনা হইতেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ব্রহ্মচারিবাবার পরমভক্ত অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী. বি, এ মহাশয়, এই গ্রন্থের সমালোচনায় নিজের যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থের প্রারম্ভে 'দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন' নামক ভূমিকাতেই দেখিতে পাইবেন। এস্থলে আর পৃথক্‌ভাবে পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে বাসনা রাখি না।

এই মহাত্মা কিরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই গ্রন্থের অবতরণিকায় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার এই উপদেশপরম্পরা পাঠ করিবেন,

তাঁহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই তাঁহার লৌকিক ও অলৌকিক জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইবার নিমিত্ত অভিলাষী হইবেন, এই সম্ভাবনা করিয়া, ইদানীং তাদৃশ পাঠকগণের সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য, তদীয় জীবনবৃত্তান্তের যতদূর গবেষণাদ্বারা জানিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উপন্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। তন্মধ্যে প্রথমে তাঁহার অলৌকিক জীবন সম্বন্ধেই কিছু বলিব।

ব্রহ্মচারিবাবার অলৌকিক জীবন-কাহিনী।

ন্যূনাধিক ৪৭ বৎসর অতীত হইল অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৭০ সনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সময়ে চিরহিমানী-পরিবৃত হিমালয় শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া দুইটী মহাপুরুষ বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালার কোনও উপত্যকায় আসিয়া পদার্পণ করেন। দীর্ঘকাল তুষারমণ্ডিত পার্ব্বত্যভূমিতে নিবাসনিবন্ধন তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে এমন এক স্থুল ও শুভ্রবর্ণ উপচর্ম্মের আবরণ পড়িয়াছিল, যে হঠাৎ দেখিলে তাঁহাদিগকে পর্ব্বতবাসী শ্বেতবর্ণ এক অভিনব বা অদ্ভুত জীব বলিয়াই বোধ হইত। এই চর্ম্মাবরণের প্রভাবেই তাঁহারা হিমালয়ের অসহ্য শীত সহ্য করিয়াও তথায় বহুকাল বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নভূমিতে উপস্থিত হইলে, সকলেই তাঁহাদের সেই শুভ্রবর্ণ

চর্ম্মচ্ছদ, ভূতলস্পর্শী সুদীর্ঘ জটাকলাপ এবং উলঙ্গ দেহ দর্শন করিয়া ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতবাসী অসভ্য লোকেরা প্রথমে তাঁহাদিগকে মানুষ না ভাবিয়া, একপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব জীব-যুগল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নিম্নভূমিতে আসিয়া বাস করিবারই সঙ্কল্প ছিল। এজন্য উভয়ে চন্দ্রনাথ পর্ব্বত পর্য্যন্ত একসঙ্গে আসিয়া, একজন তথা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নভূমিতে নামিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অপর মহাপুরুষ কামাখ্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যিনি বঙ্গের পূর্ব্বসীমাস্থ নিম্নভূমিতে নামিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি কয়েকদিন তথায় অনাবৃত স্থানে (মাঠের মধ্যে), শীতাতপ ও বাতবৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইবার নিমিত্ত গৃহাদি কোনরূপ আবরণ আশ্রয় না করিয়াই, এক বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে অযাচিত ভাবে দয়া করিয়া দুই চারিটা ক্ষীরা, শশা প্রভৃতি যাহা সম্মুখে রাখিয়া যাইত, তাহা ভক্ষণ করিয়াই তিনি ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন।

সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থানের পর এক কর্ম্মকার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া স্বীয় নৌকায় উঠাইয়া স্বকীয় গ্রামে আনয়ন করে। কিছুকাল পরে সেই কর্ম্মকার তাঁহাকে ঢাকার অন্তর্গত নরসিংদী থানার অদূরবর্ত্তী গজারিয়া নামক এক গ্রামে লইয়া যায়। মহাপুরুষ গজারিয়াতে কিছুকাল ক্ষেপণ করিয়া যদৃচ্ছা-ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে তথা হইতে সোণারগাঁ পরগণার অন্তর্গত বারদী নামক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। এই গ্রাম

নয়াবাদের প্রসিদ্ধ নাগ জমিদারদিগের বাসস্থান। এই গ্রামে আসিয়া অবস্থান করিবার পরেও কিছুকাল গ্রামবাসীরা তাঁহার বড় একটা খোঁজ খবর করে নাই। ইতিমধ্যে গ্রামের অশিক্ষিত বালক ও যুবকবৃন্দ এই উলঙ্গ পুরুষকে বিকৃত বেশে ইতস্ততঃ বেড়াইতে দেখিয়া কৌতুকচ্ছলে তাহার গাত্রে ধূলি ও লোষ্ট্র ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করে। মহাপুরুষ সেই দুর্ব্বৃত্তদের ব্যবহারে বিরক্ত ও অনন্যোপায় হইয়া কৌতুহলচ্ছলে অঞ্জলিগৃহীত মূত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে গ্রামের কোনও ভদ্রলোক গর্ভস্রাব ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে গালিও দিয়াছিলেন। গ্রামের ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁহাকে উন্মত্ত ও নীচ শ্রেণীর লোক বলিয়াই এপর্য্যন্ত ঘৃণা ও অনাদর করিতেছিলেন। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ একস্থানে বসিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিতেছিলেন। দৈবাৎ মহাপুরুষ বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অস্পৃশ্য হীন জাতি বলিয়া জানিতেন, তাই আগমন মাত্র—"দূর হ, আমাদিগকে ছুইস্ না, তুই কি না কি জাত কে জানে ?" বলিয়া কটূক্তি করেন। তখন মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"তোমরা কোন্ গোত্র।" তখন ব্রাহ্মণেরা একটু স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন—"আমরা কাশ্যপগোত্র।" মহাপুরুষ কহিলেন—"তোমাদের তিন প্রবর—কাশ্যপ, অপ্সর, ও নৈধ্রুব।" হীন অন্ত্যজ জাতির মুখে প্রবরের উক্তি শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, এবং এই ব্যক্তি যে কোন

ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হইবেন এইরূপ সন্দেহ করিলেন। মহাপুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন "পৈতা গ্রন্থি দিতেছিলে, দাও না কেন?" তাঁহারা উত্তর করিলেন—"পৈতাটাতে পেঁচ লাগিয়া গিয়াছে।" মহাপুরুষ কহিলেন—"পৈতার পেঁচ লাগিলে কি করিয়া খুলিতে হয়?" তাঁহারা কহিলেন—"গায়ত্রী জপ করিয়া খুলিতে হয়।" মহাপুরুষ কহিলেন—"তবে তাহা করিতেছ না কেন? তখন তাঁহারা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি খুলিয়া দিন না কেন?" তখন মহাপুরুষ পৈতার উপর গায়ত্রী জপ করিয়া একটা করতালী দেওয়ামাত্র পেঁচ খুলিয়া গেল।

এই ঘটনার পরক্ষণ হইতেই বারদীর বহু লোক এই মহাপুরুষকে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মনে করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। গ্রামের কতিপয় প্রধান নাগজমিদারও তাঁহার এমন ভক্ত ও অনুগত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহারা কখনও কোন সামান্য কার্য্যও সম্পাদন করিতেন না। এমন কি জমিদারী সম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম—প্রজাশাসন, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিতে লাগিলেন এবং সুফল পাইতে লাগিলেন। গ্রামের এক দেশে তাঁহার জন্য একখানি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সে স্থানে তাঁহার বাসের জন্য কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীরও নির্ম্মিত হইল। ইতিপূর্ব্বে কয়েকদিন তিনি একখানি পরিত্যক্ত ভগ্ন শিবিকার অভ্যন্তরেই বাস করিয়াছিলেন।

বারদীতে আসিয়া এই মহাপুরুষ জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। ১২৯৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১১টা ৪০ মিনিট সময়ে তাঁহার তনুত্যাগ হয়। সেইদিন সূর্য্যদেব অতি প্রখরভাবে তাপ দিতেছিলেন। এমন প্রখর রৌদ্রতাপ সাধরণতঃ প্রত্যক্ষ করা যায় না। বারদীতে তিনি প্রায় ২৭।২৮ বৎসর বাস করেন। বারদীতে দীর্ঘকাল বাস করা নিবন্ধন এদেশে তিনি "বারদীর ব্রহ্মচারী" নামেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। (১) ইঁহার নাম—শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। এখানে আসিয়াও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামবাসী ও নিকটবর্ত্তীজনপদবাসী কতকগুলি অশিক্ষিত ও নীচশ্রেণীর লোক ব্যতীত, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহাকে তাদৃশ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল; এবং অতি অল্পসংখ্যক ভদ্র ও শিক্ষিত লোকই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। অশিক্ষিত নীচশ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত। তাহারা তাঁহার আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিত না। তাহাদের মধ্যে যে সকল বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইত, তাহার বিচার নিষ্পত্তি তাঁহার নিকটেই হইত। জমীদারের দরবারে বা গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে যাইবার প্রয়োজন হইত না। তিনিও তাহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন।

(১) ইনি প্রাচীন বৈদিক প্রথানুসারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া "ব্রহ্মচারী" নামেই আপনার পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমান সময়ের শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রহ্মচারীদের ন্যায় ইঁহার নামে 'আনন্দ' পদ সংলগ্ন ছিল না।

নিম্নশ্রেণীর নিরীহ গ্রামবাসীরা গাছে ফল না হইলে, গাভীতে দুধ না দিলে, পুত্র না জন্মিলে বা জন্মিয়া পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইলে, ক্ষেত্রে শস্য না জন্মিলে, পুত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ না জুটিলে, শরীর অসুস্থ হইলে, বা কারবারে লাভ না পাইলে, সেই সেই অনিষ্টের প্রতীকারের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইয়া যথাশক্তি তাঁহার নামে মানস করিত এবং অচিরেই স্বস্ব-ইষ্টলাভে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার চরণে উপহার প্রদান করিত। মোকদ্দমাকারীরা মোকদ্দমায় জয় লাভের প্রত্যাশায় তাঁহার আশ্রমে পূজা মানস করিত এবং ইচ্ছানুরূপ ফললাভ করিয়া তথায় পূজা প্রদান করিত। যদিও তিনি অনেক সময়েই ধনী ও জমিদারদিগের সদম্ভে প্রদত্ত মূল্যবান্ উপহারেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন, তথাপি ভক্তের প্রদত্ত বলিয়া তাহাদের সামান্য উপহারও কদাচ অগ্রাহ্য করিতেন না, বরং সমধিক আদরপূর্ব্বকই প্রতিগ্রহ করিতেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া যখন যাহাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, সে তাহাই লাভ করিয়া শত মুখে তাঁহার অমানুষ মহিমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু তিনি এইরূপ মহামহিমান্বিত হইলেও, বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছুক বা চেষ্টিত হন নাই।

মহানুভব পূজ্যপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় পাঠক-বর্গের অনেকের নিকটেই সুপরিচিত, সন্দেহ নাই। এই মহাত্মা নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য ৺ অদ্বৈত প্রভুপাদের বংশধর।

যৌবনের প্রারম্ভে ইনি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া পৈতৃক বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং কিছুকাল পরেই আচার্য্য পদবী লাভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার দ্বারা সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। দৈবের গতি অচিন্তনীয়; গোস্বামী মহোদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম সেবক হইয়াও, কোনও অবিদিত কারণে হঠাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। সাধুসঙ্গের অভিলাষী হইয়া ইনি কিছুকাল সাধু মহাপুরুষদিগের অনুসন্ধানে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন এবং অনেক সাধু মহাজনের চরণ দর্শন করিয়া, একদা বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার নিকট উপস্থিত হন। গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে গুরুকৃপালাভে ও সাধনা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রগাঢ় অভিনিবেশ লাভ করিয়াছিলেন। বারদীর ব্রহ্মচারিবাবাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া, এমন বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তথা হইতে ঢাকা আসিয়া এরূপভাবে ব্রহ্মচারিবাবার জ্ঞান ও প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে তাহা শুনিয়া ঢাকার অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ লোকই তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া বারদী গমন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা তাঁহার তাদৃশ জ্ঞান ও প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলেন। অতঃপর অচিরেই তাঁহার খ্যাতি তড়িদ্‌বেগে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া দিগ্‌দিগন্ত হইতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও জ্ঞানপিপাসু সাধকসমূহ আসিয়া তাঁহার চরণ দর্শনে কৃতার্থ হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—"জহুরী ব্যতীত জহর চিনে না।" তাই তাঁহার শিষ্যনামের সম্পূর্ণ অযোগ্য আমার ন্যায় জ্ঞানহীন ও মোহান্ধ মানব সেই অগাধ জ্ঞানসমুদ্রের ইয়ত্তা করিতে অথবা তাঁহার লোকোত্তর মহিমার তত্ত্বোদ্ঘাটনে নিতান্তই অনধিকারী। তবে, বহুকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস ও আলাপ করিয়া এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া, যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি এবং জ্ঞানপথে সমধিক অগ্রসর অন্যান্য সাধক মহাত্মার নিকট শুনিয়া যতদূর অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে ব্রহ্মচারিবাবা একজন অত্যুন্নত কর্ম্মযোগী মুক্ত পুরুষ ছিলেন। কর্ম্মযোগ দ্বারা যে তাঁহার ব্রহ্মলাভ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই।

পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয় কর্ত্তৃকই ব্রহ্মচারিবাবার ব্রহ্মজ্ঞান ও লোকাতীত ঐশ্বর্য্যের কথা সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয়। ঢাকা বিভাগের অনেক শিক্ষিত লোক গোস্বামিমহাশয়কে নিরতিশয় ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার নিকট ব্রহ্মচারিবাবার তাদৃশ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা ব্যগ্র হইয়া বারদী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ঐহিক ধনসম্পৎ, আরোগ্য, ভাগ্যোন্নতি, মোকদ্দমায় জয়লাভ ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার নিকট যাইতেন। ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অতি অল্প লোকই তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন। তিনি

এই সকল লোক দেখিয়া একটু বিরক্তির ভাব অভিনয় করিয়া কখনও কখনও বলিতেন—"ওরে তোরা যে জন্য আমার নিকট আসিস্ এবং যে বিষয়ে ফল পাইয়া আমাকে মহৎ বলিয়া মনে করিস্, তাহা ত আমি মূত্রপুরীষবৎ মনে করি। কই ভবব্যাধির জন্য ত কাহাকেও আসিতে দেখি না। আর্য্যসন্তান তোরা, তোদের এইরূপ অদ্ভুত সংস্কার কোথা হইতে জন্মিল?"

এই মহাপুরুষের আসন, শয়ন, ভোজন, আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ, কথোপকথন এবং শরীরের নিত্য নৈমিত্তিক অবস্থা যাঁহারা প্রণিধানপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরোপদেশ ব্যতিরেকেও তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। ধ্যাননিমগ্নাবস্থায় তাঁহার সুতীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয়ের প্রতি যাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে এক অলৌকিক অদ্ভুত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এসম্বন্ধে ব্রহ্মচারিবাবার অন্যতম প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহোদয় স্বপ্রণীত "সিদ্ধজীবনী" নামক তদীয় চরিতাখ্যানে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পরদিন আমাদের (গুরু ব্রহ্মচারী ও আমার) মধ্যে সেই বিষয়েই তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমার কিছু দর্শনশাস্ত্র পড়া ছিল, জেরা করিয়া সাক্ষিকে আটকাইবার অভ্যাসও হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগে ব্রহ্মচারীকে অবরুদ্ধ করিলাম; এবং (আরও) নূতন প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। প্রশ্নটী :(একটী প্রশ্ন) দুই

তিন বার করিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না। তখন ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম চক্ষুঃ স্থির; যেন তিনি আর তথায় নাই। সেই বিশাল নয়নযুগলের তারকাদ্বয় উভয় দিক হইতে আসিয়া নাসিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ব্রহ্মচারী যেন চক্ষুঃকনীনিকার ছিদ্রপথ দিয়া কোন গভীর অজ্ঞাত দেশে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমার চক্ষুঃ তখন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইল এবং কোন এক স্থির, ধীর, গম্ভীরভাব আসিয়া আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। আমি আর কখন কাহারও সেরূপ ভাব দেখি নাই। মানুষ যে এমন হইতে পারে, এমন ধারণাও ইতিপূর্ব্বে আমার হয় নাই।"

১। এই মহাপুরুষ জাতিস্মর ছিলেন—তৎসম্বন্ধে সিদ্ধ-জীবনীকার স্বগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"তিনি এজন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। এমন কি গত জন্মের মৃত্যু হইতে এজন্মের ভূমিষ্ট হওয়ার প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত যে ভাবে ছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ ছিল। কিন্তু প্রসবের পর হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শৈশবকালের কথা তাঁহার কিছুমাত্র স্মরণ হয় নাই।"

ইনি বর্ত্তমান লোকনাথদেহ ধারণ করিবার পূর্ব্বে যে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দেহে বিদ্যমান্ ছিলেন, সেই কাহিনীও ভারতী মহাশয়ের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন। সীতানাথ দেহে, বর্দ্ধমান জিলান্তর্বর্ত্তী দামোদর নদের তটস্থিত

'বেড়ু' নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি ছিল। তিনি যখন একমাসব্যাপী কঠোর উপবাসব্রত দ্বিতীয়বার অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন একদিন হঠাৎ স্বকীয় পূর্ব্বজন্মের কথাগুলি স্বপ্নের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিগোচর হইল। দেখিতে পাইলেন যেন তিনি সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে দামোদর নদের তটস্থিত বেড়ু গ্রামে এক বন্দ্যোপাধ্যায়পরিবারের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। একথা তাঁহার গুরুদেবকে জানাইলেন; তিনি তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত লিখিয়া রাখিলেন। ইহার বহুকাল পরে তাঁহারা (১) পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলে, হাটিতে হাটিতে এক অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী নদী দেখাইয়া তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই নদী, এইস্থান আর কখনও দেখিয়াছ কি?" তখন তিনি পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"আমি যে আপনাকে দামোদর নদের কথা বলিয়াছিলাম, এই সেই দামোদর নদ বলিয়া বোধ হইতেছে।" অতঃপর বেড়ু গ্রামও চিনিতে পারিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বেড়ু গ্রামে যে সকল বৃদ্ধলোক জীবিত ছিলেন, তাহারা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে পর তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অনেক কথাই স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়াছিল। তিনি ভারতী মহাশয়ের নিকট ইহাও বলিয়াছেন—"সীতানাথজন্মে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমি

(১) তিনি, তাঁহার গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলী ও বেণীমাধব। (ব্রহ্মচারীর লৌকিক জীবনী দ্রষ্টব্য)।

যাহা যাহা করিয়াছি, তাহার সমস্তই এখন আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বজন্মে ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সে জন্মেও বিবাহ করি নাই, ৪০।৫০ বৎসর বয়সের সময় সে দেহ ছাড়িয়া আসিয়াছি। আমার ভ্রাতৃবধূগণ সর্ব্বদা আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেন। গত জীবনে আমার এই একটী বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল, যে আমি কাহারও সহিত মিশিতাম না, একাকী ঘরে বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতাম। অনেক সময়ে গ্রামের সমবয়স্ক বন্ধুরা আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত, কতরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, কিন্তু আমি কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইতাম না।"

২। ব্রহ্মচারিবাবার এই অদ্ভুত শক্তিও ছিল যে দেহে থাকিয়াই ইচ্ছানুসারে দেহ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন। এবং ইচ্ছা হইলে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্রও চলিয়া যাইতেন। আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব দেহে প্রবেশ করিতেন। সিদ্ধজীবনীকার ভারতী লিখিয়াছেন—

"তিনি যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, তখনও তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, দেহটী দেয়ালাদিতে ঠেশ দিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বলিত—"গোঁসাই মরিয়াছেন, কিছু পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন।"

"এইরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার বিষয় প্রসঙ্গতঃ তিনি কথার ভাবে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। বাহির হইয়া যাইয়া কি করিতেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ জানা গিয়াছে"—

(ক) "তাঁহার নিকট যে সকল লোক সাধু বা সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ পাইতেন (যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি) ব্রহ্মচারী দেহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের ভাব জানিয়া আসিতেন।"

(খ) "বর্ত্তমান সময়ের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উত্তরাঞ্চলে গিয়া কোন সঙ্কট রোগে মরণাপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম আসিলে গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ও আমার সহাধ্যায়ী ৺ শ্যামাচরণ বক্সী বারদীতে গিয়া ব্রহ্মচারীর চরণে পড়িয়া স্বীয় গুরুর প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী পূর্ব্বে না আসিবার দোষ দেখাইয়া আপত্তি করিলেন। শ্যামাচরণ কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন—'আমার আয়ুদ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিন'। শ্যামাচরণের গুরুভক্তিতে ব্রহ্মচারী তুষ্ট ও সদয় হইয়া বলিলেন—"তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, আমি বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইব। আগামী পরশ্বদিন তোমরা সংবাদ পাইবে"। ইহার পরেও ব্রহ্মচারীর দেহ বারদীতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু, অনেক সময়েই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শুশ্রূষাকারিগণ বারদীর ব্রহ্মচারীকে তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিয়াছেন। তাঁহার একজন শিষ্য আমার নিকট বলিয়াছেন—সেই রোগে গোস্বামী মহাশয়ের এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ডাক্তারেরা মৃতজ্ঞানে বাহির করিতে বলিয়াছিলেন, বাহির করার পর রোগী পুনর্জীবিত হইয়াছেন।"

(গ) "কখন বা দূরস্থ বিপন্ন শিষ্যদিগের রক্ষার্থ বাহির হইতেন। ঢাকা জজ আদালতের উকীল বাবু বিহারিলাল

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রহ্মচারীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি স্লুপে সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম হইতে আসিতে ছিলেন। পথিমধ্যে ঝটিকা উপস্থিত হইয়া স্লুপখানি আন্দোলিত করতঃ পর্য্যুদস্ত করিবার উপক্রম করে। বিহারিবাবু মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া ব্রহ্মচারীকে হৃদয়ের সহিত ডাকিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ জাহাজখানা স্থির হইল, আরোহীরা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। অনেকেই নাকি সেই সময়ে জাহাজের উপরে একখানা অভয় হস্ত দর্শন করিয়াছিলেন।"

"কয়েক মাস পরে যখন বিহারি বাবু চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া বারদীতে উপস্থিত হন, তখন আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ব্রহ্মচারী বিহারিবাবুকে দেখিয়াই বলিলেন—'কিহে বিহারি! তুমি কি ইহার মধ্যে আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে?' বিহারিবাবুর তখন স্লুপের কথা স্মরণ হয় নাই, তিনি বলিলেন—'বাড়ীতে আসিয়া আপনার পাদপদ্ম দর্শন করার ইচ্ছা হইয়াছিল বই কি?' ব্রহ্মচারী বলিলেন—'তা নয় হে! জলপথে নৌকা বা জাহাজে থাকিয়া কখনও মনে করিয়াছ কি?' তখন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি ব্রহ্মচারীর চরণে নিপতিত হইলেন এবং জাহাজে যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার যথাযথ বিবরণ গদগদস্বরে প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৩। ব্রহ্মচারিবাবার অপর এক শক্তি এই ছিল, যে তিনি কাহারও রোগ নিজ শরীরে সংক্রামিত করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত

করিয়া দিতেন। দুই তিন দিন ভোগের পরই রোগ তাঁহার দেহ ছাড়িয়া যাইত। ভারতী লিখিয়াছেন—

"আমি তাঁহার এই ক্ষমতা দেখিয়া তাদৃশ রোগ গ্রহণ করার সঙ্কেত শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—'তোমার কাঁচা শরীর এ কার্য্যের উপযোগী নহে; এরূপ করিতে গেলে তোমার পিণ্ডপাতের আশঙ্কা আছে'।"

৪। ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলেই অন্যের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন। ভারতী লিখিয়াছেন—

"তিনি (কখন কখন) এমনও প্রকাশ করিয়াছেন—'তুমি অমুক সময়ে অমুক বিষয় চিন্তা করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম।' আমি (তাঁহাকে একবার) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তুমি আমাদের অন্তরের কথা কিরূপে টের পাও?' ব্রহ্মচারী বলিলেন—'আমি যখন দেহ হইতে আলগ্ হই, তখনই এসকল জানিতে পারি'।"

"আমরা কোন গুরুতর বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মচারী যখন চিত্ত একাগ্র করিয়া তাদৃশ অবস্থা আনয়ন করিতে যাইতেন, তখন আমারা বাহ্য লক্ষণদ্বারা কিছুই টের পাইতাম না, পূর্ব্বের মত আলাপ করিতে থাকিলাম। আমাদের তাদৃশ আলাপ তাঁহার একাগ্রতা বা সমাধির পক্ষে বাধক হইত। তাতেই বলিতেন—'আমাকে যদি কথা কহিয়া নীচের দিকে রাখ, তবে যে আমি তোমাদের মতই থাকিয়া যাইব'।"

"একদা একজনের মনে সংশয় হইয়াছিল যে গুরুদত্ত মন্ত্রে অশুদ্ধি রহিয়াছে। তিনি ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে তাহার

মীমাংসা (যাথার্থ্য) জানিয়া লইবেন সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। আগন্তুক তথায় যাইয়া কিছু না বলিয়া দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মচারী আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন—'গুরুদত্ত মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা শিষ্যের কর্ম্ম নহে। গুরু যাহা বলিয়াছেন, কোন দ্বিধা না করিয়া তাহা জপ করিয়া যাওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য'।"

"অন্যের মনোগত কথা বলার শক্তি অনেকেরই (সাধু মহাজনেরই) থাকিতে পারে, (কিন্তু) ব্রহ্মচারী যেমন প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া বলিয়া দিতেন, অন্যেরা তেমন ভাবে বলিতে পারেন না।"

৫। ব্রহ্মচারী লোকের মনোগত ভাব যেমন প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারিতেন, দূরস্থ ও ভাবী ঘটনা সকলও সেইরূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ ছিলেন। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এক সময়ে কলিকাতানিবাসী কোন বড় ঘরের একব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ও সম্পত্তির পরিচয় দিয়া ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ করাইতে যত্ন করিলাম। ব্রহ্মচারী একটু চিন্তা করিয়া সেই আগন্তুক ভদ্রলোককে বলিলেন—'তোমরা এখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেছ ?' বারদীতে বসিয়া ব্রহ্মচারী কলিকাতার কোন বড় ঘরের ব্যক্তি যে পৈত্রিক ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন, এতদূর পর্য্যন্ত অবগত হইলেন, (আমিও কিন্তু তাঁহাদের ভাড়া বাড়ীতে থাকার কথা জানিতাম না)

দেখিয়া সেই ভদ্রলোক পরম বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'হাঁ মহাশয়! অনেক পাকচক্রে পড়িয়া নিজ হিস্যার বাড়ী ছাড়িয়া এখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেই আছি।"

৬। ব্রহ্মচারীর আর এক শক্তি ছিল—তিনি দূর হইতে অন্যকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ভারতী লিখিয়াছেন—

"তিনি যখন আমাদের (শিষ্যদের) মধ্যে কাহাকেও দূর হইতে নিকটে আনয়ন করিতে চাহিতেন, তখন আমাদের অন্তঃকরণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত যে কিছুতেই বারদীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না। (একবার) তথায় যাইয়া এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—'আমি তোমায় ডাকিয়াছিলাম'।

ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুসারে দূর হইতে কোন ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহার এমন বলবতী ছিল, যে শুনিতে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এবিষয়ে ভারতী মহাশয় তাঁহার স্বচক্ষে দৃষ্ট এক ঘটনার কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"তিনি যখন বহুসংখ্যক রোগীর দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন বলিলেন—'এরূপ হইলে আমি দেহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইব'। তিনি যে যোগবলে নিদ্রাকে অতিক্রমপূর্ব্বক মৃত্যুর সম্ভাবিত কাল অতীত করিয়া এতদিন জীবিত ছিলেন এবং ইচ্ছা করিলেই মোহকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারেন, এই কথায় লোকে তেমন আস্থা করিত না। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহুসংখ্যক রোগী আশ্রম পূর্ণ করিতেছিল। তখন তিনি মেজিষ্ট্রেটের সাহায্যে লোকদিগকে নিবারণ করিতে সংকল্প

করিলেন এবং আমার প্রতি আদেশ করিলেন—'মেজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া দরখাস্ত কর, যে আমার গুরুর আশ্রমে যাহাদিগকে আসিতে বা থাকিতে নিষেধ করা হয়, তাহারা সেই কথা না মানাতে গুরুর পিণ্ডপাত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব (তাহারা) যাহাতে ভবিষ্যতে আর না আসে এমন ভাবের এক নিষেধাজ্ঞা সরকার হইতে জারি হউক'।"

"আমি তাঁহার আদেশমত নারায়ণগঞ্জ মহকুমাতে যাইয়া মেজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ বিষয়ে ফরিয়াদী হইতে প্রস্তুত হইলাম। লোকনাথ আমাকে বারণ করিয়া বলিলেন—'এখন যাইও না, দুই তিন দিন মধ্যে মেজিষ্ট্রেট সাহেবই এখানে আসিবেন; তখন দরখাস্ত করিও।' গুরুদেব নিজ ঐশী শক্তির পরিচালন দ্বারা জয়েণ্ট-মেজিষ্ট্রেটকে বারদীতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এভাব তখন আমার মনে আসিল না। আমি মনে করিলাম হয়ত লোকমুখে শুনিয়া মেজিষ্ট্রেট আসিবেন বলিতেছেন। আমরা কিন্তু অন্য কাহারও নিকট মেজিষ্ট্রেটের বারদী আসিবার কথা শুনি নাই। এসকল কথার পূর্ব্বে ততটা প্রচারও হয় না। দেখিতে দেখিতে সেই দুই তিন দিনের মধ্যে ২০০।৩০০ হাত দূরে সাহেবের তাম্বু গাড়া হইল। আমি যথাসময়ে মোক্তারদের সাহায্যে দরখাস্ত দাখিল করিলাম। আমার সেই দরখাস্ত অনুসারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াই সাহেব তাম্বু উঠাইয়া প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে যাত্রায় মেজিষ্ট্রেট বারদীতে আসিয়া এই হুকুম দেওয়া ভিন্ন আর কোন কার্য্যই

করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধ এই কার্য্যের নিমিত্তই তিনি বারদী আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

"আমরা দেখিয়াছি দূরবর্ত্তী থাকার কালে, গুরুদেব যদি কখনও আমাদিগকে নিকটে আনিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন আমাদের মধ্যে এমন একরূপ প্রেরণা উপস্থিত হইত, যে তাহার প্রভাবে আমরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতাম না; বারদী আসার জন্য উতালা হইয়া পরিতাম। নিকটে আসিয়া গুরুদেবকে এরূপ হওয়ার, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—'আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছিলাম'। তাহাতেই বলি—জয়েণ্ট মেজিষ্ট্রেট সেই ভাবেই আকৃস্ট হইয়া আসিয়াছিলেন এবং শুদ্ধ আমার দরখাস্তের হুকুম দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।"

৭। জগতের প্রাকৃতিক ঘটনার উপরেও তাঁহার ঐশী শক্তি অব্যাহত রূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিত। এই বিষয়ে সিদ্ধজীবনীর প্রণেতা ভারতী মহাশয় এই আশ্চর্য্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

(ক) "এক সময়ে কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া পদব্রজে ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। সূর্য্যের উত্তাপ অতিশয় প্রচণ্ড দেখিয়া তাঁহারা নানারূপ ইতস্ততঃ করাতে, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—'চলিয়া যাও, সূর্য্যের উত্তাপ ভুগিতে হইবে না'। তাঁহারা কিয়দ্দূর চলিয়া দেখিলেন একখানি বৃহৎ মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিল। এই ব্যাপারকে ব্রহ্মচারীর

আদেশের ফল মনে করিয়া, তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহারা পুনরায় আশ্রমে আসিয়া বলিলেন—'প্রভো! আপনার আদেশ মতে মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া আমাদিগকে ছায়াদান করিয়াছে। কিন্তু আমাদের সন্দিগ্ধচিত্ত ইহাতেও তুষ্ট হয় নাই। আমরা জানিতে চাই আমরা কোন্ স্থানে পৌঁছিলে মেঘ অপসৃত হইয়া সূর্য্যকে মুক্ত করিবে।' ব্রহ্মচারী কহিলেন—'তোমরা ঢাকা সহরের প্রান্তবর্ত্তী দয়াগঞ্জে উপনীত হইলে পুনরায় রৌদ্র উঠিবে'। বারদী হইতে দয়াগঞ্জ ৮।১০ ক্রোশ ব্যবহিত। তাহারা এই পথ অতিক্রম করিয়া দয়াগঞ্জে উপস্থিত হওয়া মাত্র পুনরায় খরতর সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পাইল। তদ্দর্শনে বাবুরা চমৎকৃত হইয়া বাসস্থানে না যাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার বারদীতে ফিরিয়া যাইয়া মহাপুরুষের চরণে পতিত হইলেন।"

ঢাকা দয়াগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত "লোকনাথ আশ্রম" যাহা "শক্তিব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" বা সাধারণতঃ "মথুরবাবুর আশ্রম" নামে পরিচিত তাহার সঙ্গে এই ঘটনার কি সম্পর্ক আছে তাহা বুঝাইবার জন্য "সিদ্ধজীবনীকার" ভারতী মহাশয় সিদ্ধজীবনীতে "লোকনাথের দেহত্যাগ" নামক অধ্যায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"সূর্য্যদেব সেদিন দয়াগঞ্জে পুনঃ প্রকটিত হইয়া এই দয়াগঞ্জে এই লোকনাথাশ্রমের ভাবী সূচনা কি দেখাইয়াছিলেন?

উপরিলিখিত মতে সূর্য্যের সহিত ব্রহ্মচারিবাবার সম্বন্ধ থাকার বৃত্তান্তটী আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতেছে। যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বাহিরের আকাশে যাহা আদিত্যরূপে

বিরাজিত দেখা যায়, যোগীদিগের হৃদয়ে ও তাঁহাকে সেইরূপে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাক্রিয়াতে "সূর্য্য আত্মা জগতস্ত-স্থুষশ্চ" বলিয়া সেই সূর্য্যকে অন্তরে উপস্থান করিয়া থাকেন। গুরুদেব যখন আত্মস্থ ছিলেন, তখন আপনাতে ও সূর্য্যেতে অভেদ ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন মনে করিতে হয়।

দয়াগঞ্জে ব্রহ্মচারিবাবার আশ্রম অভাবনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সেদিনকার দয়াগঞ্জে সূর্য্যপ্রকট হওয়া এবং এই দয়াগঞ্জে শক্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বের মত ইহা বাবার ভক্তগণের আশ্রয় স্থান হওয়া, এই উভয়কে অনেকে ব্রহ্মচারিবাবার একই দৈব শক্তির প্রেরণা মনে করেন।"

বাস্তবিকই ব্রহ্মচারিবাবার দেহত্যাগের পর হইতে ১৩১২ সনে দয়াগঞ্জে লোকনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে সময় গিয়াছে সেই সময়ে ব্রহ্মচারিবাবা সম্বন্ধে উচ্যবাচ্য বিশেষ কিছুই শুনা যায় নাই, যেন তিনি ছিলেন, দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সকলই লোপ হইয়া গিয়াছে অনেকে এমন কি তাঁহার অনেক শিষ্যসেবকও এমনই মনে করিতেন। স্বপ্রকাশ সূর্য্যরূপ ব্রহ্মচারিবাবাকে এই সময়ে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু দয়াগঞ্জে তাঁহার ইচ্ছানুসারে যখন রৌদ্র উঠিয়াছিল তখনই অন্তর্য্যামী বাবা দয়াগঞ্জে ভবিষ্যৎ "লোকনাথ আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন;

এ বিষয়ে ভারতী মহাশয় এইরূপ আরও দুই তিনটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

(খ) "একব্যক্তি জাল করার অপরাধে কোন মহকুমার মেজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হন। তিনি অপরাধ অস্বীকার করেন। এদিকে বারদীতে আসিয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করেন। মহাপুরুষ অভয় দিয়া বলিলেন—'তুমি মুক্তিলাভ করিবে'। অভিযুক্ত ব্যক্তি তচ্ছ্রবণে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মচারীর একজন সেবক অভিযুক্তকে দোষী বলিয়া অবগত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, এই লোকটা সাধুকে ফাঁকী দিয়া অভয়বাণী লইয়া যাইতেছে। এই ব্যবহার তাহার নিকট অসহনীয় বোধ হইলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন—'মহাশয়! আপনি সাধুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, সেইরূপই ফল পাইতে পারেন, অধিক প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আপনি যদি স্বয়ং দোষী হইয়া সাধুর নিকট আপনাকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন করিয়া অভয়বাণী আদায় করেন, তাহা হইলে সাধুর প্রদত্ত অভয়বাণীও উলটিয়া ভয়-বাণীতে পরিণত হইতে পারে না কি? আপনি যদি সাধুর নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া অভয়বাণী গ্রহণ করেন, তবে সাধুর কথিত কথাও আপনার মিথ্যা আচরণে মিথ্যা হইতে পারে।'"

"অভিযুক্ত পুরুষ এই কথায় চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—'সাধারণ লোকের নিকট প্রতারণা করিয়া পার পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাধুকে ঠকাইয়া গেলে স্বয়ংই ঠকিতে হয়।' তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া পুনরায় ব্রহ্মচারীর চরণে পড়িলেন।

বলিলেন—‘আমি অপরাধী ত আছিই, আপনার নিকট মিথ্যাকথা কহিয়া সে অপরাধের মাত্রা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছি। এক্ষণে অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আমায় রক্ষা করুন।’ ব্রহ্মচারী বলিলেন—‘যদি যথার্থ আমার শরণাপন্ন হইয়া থাক, তবে আমি যাহা বলি সেরূপ করিতে পার কি?’ অপরাধী বলিল,—‘অবশ্য পারিব।’ ব্রহ্মচারী পুনরায় বলিলেন—‘যাও বিচারকের নিকট যাইয়া স্বমুখে দোষ স্বীকারপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কর, আমি যে বলিতেছি মুক্তিলাভ করিবে সে কথার অন্যথা হইবে না।’ অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাই করিলেন—বিচারের দিন জয়েণ্ট মেজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলিলেন। মেজিষ্ট্রেট ভাবিলেন—‘লোকটা ভয় বা প্রলোভন প্রযুক্ত এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে, নথীস্থিত প্রমাণের সহিত কিন্তু ঐক্য হইতেছে না।’ এজন্য অভিযুক্তের মোক্তারদের প্রতি কিছু ইঙ্গিত করিলেন। মোক্তারেরা আসামীকে অপরাধ অস্বীকার করার জন্য উপদেশ ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আসামী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—‘আমি দোষী, শেষ পর্য্যন্ত আমার দোষ আমার স্বমুখে ব্যক্ত করিব।’ মেজিষ্ট্রেট আর কি করেন, অগত্যা অভিযুক্তকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিতে বাধ্য হইলেন। আসামী সেসনে গিয়াও সেই কথা বলিতে লাগিলেন—‘আমি দোষী’।”

“জুরিগণও মেজিষ্ট্রেটের ন্যায়—আসামী নির্দ্দোষ, কেবল ভয় বা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতেছে,—স্থির

করিলেন। সেসন জজ জুরীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইলেন। হাইকোর্টের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিয়া বারদীতে আসিয়া ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া যখন আপনাকে বিকাইতেছেন, তখন আমি বারদীতে উপস্থিত হইয়া ঐসকল ব্যাপার অবগত হইলাম।"

(গ) "বারদীতে একব্যক্তির পাদদেশে সর্পে দংশন করে বিষ প্রবল হইয়া সকল অঙ্গ ছাইয়া উঠিতে থাকে। ওঝা বৈদ্য আসিয়া বিষ নামাইবার যত্ন করিল। এদিকে, আরোগ্য হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রহ্মচারীকে কিছু পূজা দেওয়ার মানস করা হইল, ক্রমে বিষ নামিয়া আসিল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল; তখন রোগীর আত্মীয়েরা মনে করিল, চিকৎসার গুণে বিষ নামিয়াছে, ব্রহ্মচারীর কৃপায় নহে; অতএব পূজা দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। এই ভাবে ব্রহ্মচারীর নিকট মানসিক পূজা দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সকলেই নিশ্চিন্ত আছে। এক বৎসর কাল পরে, সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন উপলক্ষে কিছু দূরস্থানে গিয়াছিল, ফিরিয়া বাড়ী আসার সময়ে অকস্মাৎ সেই শুষ্ক ক্ষত স্থানে বেদনা উপস্থিত হইল এবং বিষ পূর্ব্ববৎ পরাক্রম সহকারে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল, রোগী (বিষের জ্বালায়) ছট্ফট্ করিয়া (ভূতলে) পড়িয়া গেল। বাড়ীতে সংবাদ আসিলে আত্মীয়স্বজনগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে আনয়ন করিল। হঠাৎ এই বিপদ্দর্শনে সকলেই অধীর হইল। তখন ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসিয়া নালিশ করিল এবং বিশিষ্টভাবে পূজা দিয়া নিষ্কৃতি

লাভ করিল।" (এই ঘটনা বাবার নিত্য সেবক ৺ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন)।

৮। ব্রহ্মচারিবাবার প্রভাব দেবতার শক্তিকেও অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিত। এসম্বন্ধেও ভারতী মহাশয় একটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"লোকনাথ একদা আশ্রমের পার্শ্বে, ঘরের বাহিরে উপবিষ্ট আছেন, এমন কালে দেখিলেন, একটী রক্ত-বস্ত্র-পরিধানা স্ত্রী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। মেয়ে লোকটী শীতলামুখী অর্থাৎ তাহার মুখে বসন্তের দাগ আছে। স্ত্রীলোকটী শীতলাদেবী বলিয়া বোধ হইতেছিল। দেবী বলিলেন—'আমি এখান দিয়া যাইব'। লোকনাথ কহিলেন—'না, এখান দিয়া যাইতে পারিবে না'। কিছুকাল উভয়েই নিস্তব্ধ, পরক্ষণে দেবী লোকনাথের সম্মুখদিকে এক পা বাড়াইলেন। লোকনাথ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন— 'আমি যে এখানে আছি, আমি কি কিছুই নই?' দেবী তৎক্ষণাৎ পা উঠাইয়া পূর্ব্ব স্থানে দাঁড়াইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন— 'আমি কি যাইবার পথ পাইবনা—এখানে কি আবদ্ধ থাকিব?' লোকনাথ উত্তর করিলেন—'না, বদ্ধ থাকিতে হইবে না; এই যে নিকটে ছাওয়াল বাঘিনী নদী (খাল), ইহার পার্শ্বস্থ ঢালু ভূমি দিয়া চলিয়া যাও, উচ্চতর সমভূমিতে উঠিও না'। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আশ্রমের অনতিদূরে এক ভূঁইমালীর বাড়ীতে বসন্ত হইয়া দুইটী লোক মারা যায়। তখন গৃহস্বামী লোকনাথের নিকটে নালিশবন্দী হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন,

তাহার বাড়াটী ঐ নদীর তীরে ঢালু ভূমির উপরে স্থাপিত। অতএব আদেশ করিলেন—'বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা কর।' সে তাহাই করিল। (২)

৯। তির্য্যগ্‌জাতির (পশুপক্ষ্যাদির) হৃদয় ও মনের উপরেও তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে আকর্ষণ, চালন ও কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেন; এবং এসম্বন্ধেও দুই একটা সুন্দর ঘটনা "সিদ্ধজীবনীতে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে. তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক) "বারদীর আশ্রমে ভজ্‌লেরাম নামক এক বৃদ্ধা সেবিকা বাস করিত। সে একদা ব্রহ্মচারীর নিকট আব্‌দারের ভাবে বলিল,—'আমি কখনও বাঘ দেখি নাই, আমাকে একটা বাঘ আনিয়া দেখাইয়া দিন'। ইহার কয়েক দিন পরে রাত্রিশেষে একটা চিতাবাঘ, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপনীত হইল। তখন গুরুদেব ভজ্‌লেরামকে ডাকিয়া জাগাইয়া, বাঘ দেখিতে বলিলেন। ভজ্‌লেরাম উঠিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল। আশ্রমের অভ্যাগত লোক-প্রভৃতি অন্য যাহারা শুইয়াছিল, তাহারাও বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইল। এত লোকের সাড়া পাইয়া ব্যাঘ্রটা পলায়নপর হওয়াতে ভজ্‌লেরাম কহিল—'গোঁসাই! বাঘকে

(২) এই ঘটনাটি নব্য শিক্ষিতদিগের কর্ণে স্থান পাইবে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মচারিবাবা স্বয়ং "অসম্ভবং ন বক্তব্যম্" এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করিয়া শিষ্যদিগকে অসম্ভব ঘটনা প্রকাশ করিতে বারণ করিতেন। তথাপি ঘটনাটি প্রকৃত সত্য বলিয়াই আমরা এস্থানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

আর কিছুক্ষণ রাখুন, ভাল করিয়া দেখিয়া লই'। দেখিতে দেখিতে বাঘ নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলার মধ্যে প্রবেশ করিল......।"

(খ) অরণ্যবাস সময়ে তিনি ব্যাঘ্রীর সহিত যেরূপ আলাপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও ভারতী মহাশয় এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"লোকনাথ ও (তাঁহার সহচর) বেণীমাধব ব্রহ্মচারী বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকৃস্থিত পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের জনহীন জঙ্গলে আতিথ্য গ্রহণ করতঃ এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের ক্ষণকাল পরে ব্রহ্মচারিদ্বয়ের কয়েক হস্ত ব্যবধানে থাকিয়া এক ব্যাঘ্রী ভীষণ রবে কানন ও পর্ব্বত নিনাদিত করিয়া তুলিল। সে চিতা ব্যাঘ্রী নহে, বঙ্গদেশের বিখ্যাত হিংস্রপ্রধান বৃহজ্জাতীয় বাঘিনী; ঘোর রবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিতে থাকায় গুরুদেবের চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ধ্যানে দেখিলেন—ব্যাঘ্রী নবপ্রসূতা; কয়েকটী সদ্যোজাত শিশুসন্তান সম্মুখে রাখিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ব্যাঘ্রীর মনোগতভাব জানিবার জন্য ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, অবগত হইলেন—অভ্যাগত ব্যক্তিদ্বয় পাছে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সন্তানগুলি অপহরণ করিয়া লয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। তখন তিনি বাঘিনীকে বলিতে লাগিলেন—'তোমার কোন ভয় নাই। তুমি শিশুসন্তান লইয়া সুখে নিদ্রা যাও; আমরা ব্রহ্মচারী, আমাদের হইতে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, আর চীৎকার করিও না, এখন শান্ত হও'।

ইহার পরে বাঘিনীর ঐরূপ চীৎকার অল্পে অল্পে শান্ত হইয়া কাননের নিস্তব্ধতা সম্পাদন করিল। এইভাবে মনুষ্য ও ব্যাঘ্র স্বস্বস্থানে সেই দিন অতিবাহিত করিল। পরদিন বাঘিনী পুনরায় চীৎকার আরম্ভ করিল ; ব্রহ্মচারী কারণ জানিবার জন্য আবার গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং জানিতে পারিলেন, বাঘিনী সবে এইমাত্র প্রসূতী হইয়াছে, পূর্ব্বে আর প্রসব করে নাই। তাহাতেই সন্তানগুলিকে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে বুঝিতে পারিতেছে না। এদিকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া সন্তানগুলিকে কোথায় রাখিয়া আহার সংগ্রহ করিবে, এই সমস্যায় পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। তখন ব্রহ্মচারী উঠিয়া বাঘিনীকে বলিতে লাগিলেন—'তুমি সন্তানগুলি এখানে রাখিয়া শীকার করিতে যাও, ছেলেদের জন্য কোন আশঙ্কা করিও না। আমি উহাদিগকে রক্ষা করিব'। এই সকল কথা যেমন মনে মুখে বলিতে লাগিলেন, তেমনি আবার হাত দিয়া ইসারা করিয়া নিজ মনের ভাব তাহার অন্তরে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মচারী বারংবার ঐরূপ করিলে পর ব্যাঘ্রী তাহা মানিয়া একাকিনী শীকারে বহির্গত হইল। ব্রহ্মচারীরা আপন আপন ব্যাপারে নিবিষ্ট হইলেন। ঐ পাহাড়ে তাঁহারা ফলমূল মাত্র ভক্ষণ করিতেন। অনেকক্ষণ পরে বাঘিনী দুই তিন বার আওয়াজ করিয়া ক্ষান্ত হইল। ব্রহ্মচারী বুঝিলেন, বাঘিনী বলিতেছে—'আমি আসিয়া চার্জ্জ গ্রহণ করিলাম, তুমি অবসর গ্রহণ কর'। ইহার পর পুনরায় আহারান্বেষণের সময় হইলে, যখন যখন

ব্যাঘ্রী সন্তানদিগকে আবাসে রাখিয়া বহির্গমন করিত, তখন ব্রহ্মচারীকে জানাইয়া যাইত—'আমি শীকারে চলিলাম, তুমি শিশুদিগকে রক্ষা করিও'। এই ভাবে ব্রহ্মচারিদ্বয় তিন চারি দিন তথায় কাটাইয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহারা প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে পর ব্যাঘ্রীর প্রচণ্ড রব শুনিতে পাইলেন; যত পথ অতিক্রম করেন, ততই তাহার চীৎকার শুনেন। তখন লোকনাথ বেণীমাধবকে বলিলেন, 'বেণী! আজ যাওয়া হইল না, বাঘিনীর বড় কষ্ট হইতেছে, আর কিছুকাল এখানে থাকা যাউক'। বেণী তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না। উভয়ে যাইয়া পূর্ব্বস্থানে উপনীত হইলেন এবং বাঘিনীকে বলিলেন—'যত দিন তোমার ছেলেরা তোমার সঙ্গে যাইতে না পারিবে, ততদিনের জন্য আমরা এখানে রহিয়া গেলাম। তুমি আর দুঃখ করিও না; এখন শান্ত হও'। বাঘিনী চুপ করিল। তদবধি ব্যাঘ্রী শীকারে যাইবার সময়ে ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বের মত বলিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া গর্জ্জন করিয়া আপনার প্রত্যাগমন বার্ত্তা জানাইত। এইরূপ একমাস গত হইলে ব্রহ্মচারী দেখিলেন, বাচ্চাগুলি বাঘিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, কিন্তু কিছুদূর যাইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার পর, একদিন বাঘিনী যখন শীকারে চলিল, শাবকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে গেল। সে দিন আর পথ হইতে ফিরিয়া আসিল না। ব্রহ্মচারী তখন আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইয়াছে ভাবিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।"

(গ) "তাঁহার নিকট রাশি রাশি পিপীলিকা উপস্থিত হইত, তিনি কখন পরিচারকদিগকে ডাকিয়া বলিতেন,—'ইহাদিগকে কিছু খাইতে দাও'। কখনও বা মুখ পাতিয়া অস্ফুটস্বরে পিপীলিকাদিগকে কি বলিতেন, আর তাহারা প্রস্থান করিত।"

(ঘ) "এক সময়ে তাঁহার কৃষিকার্য্য করিতে সখ হইয়াছিল। ভূম্যধিকারীরা তাঁহার আশ্রিত, অবিলম্বে তাহা সম্পাদিত হইল। ক্ষেত্রে চাষ ও ধান্য বপন যথা সময়ে সম্পন্ন হইল। চারাসকল পরিণত হইয়া যখন ধান্য প্রসব করিল, তখন পোষিত শূকর সকল ছুটিয়া গিয়া তাহা পয়মাল করিতে লাগিল। তাঁহার আশ্রম-রক্ষিগণ যষ্টি সংগ্রহ পূর্ব্বক, শূকরদিগকে প্রহার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত। ক্ষেত্রে শূকরপ্রবেশের শব্দ পাইয়া, যষ্টি হস্তে করিয়া গিয়া দেখিত, তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই বরাহগণ প্রস্থান করিয়াছে। একদিনও তাহাদিগকে ক্ষেত্রে দেখিতে পাইত না; শূকরেরা যেন দূতমুখে রক্ষীদের আগমনের সংবাদ শুনিয়া পলায়ন করিত। আশ্রমবাসীরা ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইত এবং আপনারা বলাবলি করিত। ব্রহ্মচারীর একজন পার্শ্বচর ভক্ত এই রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং আশ্রমে বসিয়া বরাহদিগকে পলায়ন করিতে বলিয়া দেন। তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন রক্ষীরা যখন লাঠি লইয়া তাড়া করার জন্য আশ্রম হইতে বহির্গত হইত, তখন ব্রহ্মচারী শূকরদিগকে সম্বোধন করিয়া চুপি চুপি বলিতেন—'তোরা শীঘ্র প্রস্থান কর তোমাদিগকে মারিতে আসিতেছে'।"

১০। তাঁহার চক্ষুঃ, মূর্ত্তি ও বাক্যের এমনই এক স্বাভাবিক প্রভাব ও তেজঃ ছিল, যে দেখিয়া ও শুনিয়া অধার্ম্মিক, পাষণ্ড এবং নাস্তিকের হৃদয়ও ভীত, কম্পিত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িত। ভারতী লিখিয়াছেন ঃ—

"বারদীর কোন জমিদার লোকনাথের কৃপায় জমিদারদিগের মধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। তাঁহার মরণান্তর তাঁহার পুত্রেরা জমিদার হইলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র গোঁয়ার গোবিন্দ ; স্থির করিলেন ব্রহ্মচারী কোন মন্ত্র বা ঔষধের বলে এত অঘটন ঘটাইয়া সকলের পূজা পাইতেছে। তাহা হইতে সেই সকল মন্ত্র বা দ্রব্য কাড়িয়া নিলেই ত আমি তেমন হইতে পারিব। এই ভাবিয়া গোপনে লাঠিয়াল সংগ্রহ করিলেন। কারণ, তাহার সরিকেরা টের পাইলে, বাধা দিয়া দাঙ্গা বাঁধাইতে পারে। একদা গভীর রাত্রিতে লাঠিয়াল সহ ব্রহ্মচারীর আশ্রম আক্রমণ করিলেন। একজন হিন্দুস্থানী সাধু আশ্রমে ছিলেন, তিনি যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অনেক অস্ত্রধারী সর্দারের সহিত একক কতক্ষণ যুঝিবেন ? তিনি জখ্‌মি হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন জমিদারনন্দন ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আসন হইতে দুই হাতে তুলিয়া বলিলেন—'তোর ক্ষমতাপ্রকাশের যাহা যাহা আছে শীঘ্র আমাকে দে। নতুবা এখনি আছাড় দিয়া ফেলিব'। সেই দুরাত্মাকর্ত্তৃক সজোরে গৃহীত হইয়া লোকনাথ বলিলেন— 'দেখ্‌রে অমুক ! এখনও আমার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই। আমার ক্রোধ আসিলে কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা নাই"ঃ

কথাগুলি যাইয়া জমিদার যুবকের অন্তস্তল এতই স্পর্শ করিল যে সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল। অন্যান্য হিস্যাতে এই সংবাদ গেলে, পরদিন আহত সাধুকে লইয়া তাহারা প্রবল মামলা মোকদ্দমা চালাইতে আরম্ভ করিল।”

১১। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিশক্তিও অদ্ভুত ছিল। এই ১৫০ কি ১৫৫ বৎসর বয়সেও তাঁহার চক্ষুর তেজঃ এবং দৃষ্টিশক্তির তীব্রতার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় একপ্রকার দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার শরীরের গঠন সাধারণ মনুষ্যের মত হইলেও চক্ষুর্দ্বয় এক অভিনব আকারে গঠিত হইয়াছিল, অথবা যোগের প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারাই অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছিল। যাঁহারা জীবিতাবস্থায় তাঁহার চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা তাঁহার ফটো অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তাঁহার নেত্র অতীব বিশাল ও তেজস্বী ছিল। বাবার চক্ষুর পলক কেহও কোনওদিন দেখে নাই। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই জাগ্রত সমাধিতেই থাকিতেন চক্ষু দেখিয়া বোধ হইত যেন দুখানা বড় হীরকখণ্ড পাষাণ প্রতিমায় লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। ভারতী লিখিয়াছেন—“আমরা স্থির দৃষ্টিতে চাহিলে আমাদের উভয়নেত্রের তারকাযুগল চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থান করে, কিন্তু লোকনাথ চক্ষুঃ স্থির করিলে তাঁহার উভয় নেত্রের তারকা আসিয়া নাসিকার পার্শ্বে সংলগ্ন হইত।”

মহাত্মা জানকীনাথ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—"তাঁহার চক্ষুর তেজঃ সাধারণ লোকে সহ্য করিতে পারিত না। ১৬।১৭ বৎসরের ছেলেরা ব্রহ্মচারীর চক্ষুর দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইত। তাঁহার চক্ষুর নিকট দূরবীক্ষণ যন্ত্রও লজ্জা পাইত। ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বোক্ত (১০ লিখিত) নাগপুত্র সম্বন্ধীয় ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জের মেজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নিতে হইয়াছিল। মেজিষ্ট্রেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বয়স কত?' ব্রহ্মচারী (বলিলেন) '১৫০ কি ১৫৫'। মোক্তারেরা বলিলেন—'এ আদালত এখানে এরূপ অসম্ভব কথা বলা চলে না'। ব্রহ্মচারী (বলিলেন)—'আচ্ছা, যাহা সম্ভব হয় লিখিয়া লও'। তখন ৭০।৭৫ বৎসর লিখিয়া অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর লওয়া হইল। উহার পরে বিপক্ষের মোক্তারের জেরা করার সময় আসিল। বিপক্ষের মোক্তার দেখিলেন—এই সাক্ষীর স্বয়ং ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে হইবে। সাক্ষী আপনাকে অতি বৃদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন দেখিয়া সেইদিকে ঝোঁক দিয়া প্রশ্ন করিলেন—'আপনি ত বলিয়াছেন, দেড়শত বৎসরের বৃদ্ধ তাহা হইলে দৃষ্টিশক্তি খুব কমিয়া গিয়াছে, অতদূর পর্য্যন্ত আপনার দৃষ্টি অবশ্যই চলে না। ঘটনাটী অতদূর হইতে অবশ্যই দেখিতে পান নাই'। ব্রহ্মচারী পরিষ্কার উত্তর দেওয়ার জন্য বিপক্ষের মোক্তারকে নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক দূরে একটী বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন—'ঐ বৃক্ষটীতে কোন প্রাণী আরোহণ করিতেছে এমন দেখা যায় কি?' মোক্তার বলিলেন—'না'। ব্রহ্মচারী (বলিলেন)

"তোমরা যুবক, কিছুই দেখিতে পাইতেছ না? আমি এখান হইতে দেখিতে পাইতেছি একদল লাল পিপড়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভূতল হইতে বৃক্ষের ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করিতেছে'। কাছারী শুদ্ধ লোক একথা শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল চিত্তে সেই বৃক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; অনেকে বৃক্ষের তলায় গিয়া লাল পিপড়ার শ্রেণীকে ঊর্দ্ধে উঠিতে দেখিয়া আসিল।"

১২। লোকনাথ ইচ্ছা করিলেই রোগীকে দর্শন মাত্র নারোগ করিয়া দিতে পারিতেন। এইজন্য দিগ্‌দিগন্ত হইতে ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, কত ব্যক্তি যে তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পড়িয়া থাকিত তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি যাহাকে অনুগ্রহ করিতেন সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রসাদ পাইয়া রোগমুক্ত হইয়া চলিয়া যাইত। যে বারদীতে ইতিপূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে ওলাউঠা, জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি সাময়িক উৎকট রোগে শত শত লোক অকস্মাৎ কালকবলে পতিত হইত, তাঁহার আগমনে সেই গ্রামে আর ঐ সকল রোগের উৎপাত এককালেই দৃষ্ট হয় নাই। সিদ্ধজীবনীর প্রণেতা ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমার জিজ্ঞাসা মতে লোকনাথ বলিয়াছেন—'আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি মড়া বাঁচাইয়া দিতে পারি কিনা দেখিব। তদবধি তাঁহার নিকট মৃতকল্প রোগী সকল আসিতে থাকে এবং আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যায়। এই সকল ঘটনা প্রকাশ পাওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতে রোগী সকল আসিয়া তাঁহার আশ্রমটীকে বড় রকমের একটী হাসপাতাল করিয়া তুলিল। তখন (তিনি)

দেখিলেন—এসকল তাঁহার সংসার হইয়া পড়িতেছে। তিনি আর ত পরোপকারব্রতের কর্ত্তব্য জ্ঞানে বদ্ধ ছিলেন না ; এজন্য রোগী আসিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রোগীরা সে কথা শুনিবে কেন ? তিনি যতই নিষেধ করেন, ততই রোগীদিগের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নূতন রোগী আসিলে বলিতে লাগিলেন—'তোমার পীড়ার কথা ত শুনিলাম, আমার কিন্তু বৈদ্যশাস্ত্র পড়া নাই ; তোমরা ডাক্তার কবিরাজের নিকট যাও ; আমি ভবরোগের বৈদ্য, সেই রোগ আরামের জন্য কেহ আইসে না কেন ?' তাহারা কিন্তু কাকুতি মিনতি করিয়া পড়িয়া থাকিত। লোকনাথ মিষ্ট বাক্যে কত বুঝাইতেন। তাহারা ভাবিত—এরূপ বলা সাধুদের রীতি। তিনি বিনয় সহকারে বলিতেন—আমি অনায়াসে যদি তোমাদিগকে ভাল করিয়া দিতে পারি, তবে পাপিষ্ঠের মত এত নিষেধ করিব কেন ?' রোগীরা ও তাহাদের আত্মীয়েরা এসকল কথা কথার মধ্যেই ধরিত না। (একদা) একজন বলিয়াছিল—'আপনি বাক্‌সিদ্ধ, বাক্য পাইলেই রোগ যায়।' লোকনাথ বিরক্তি সহকারে বলিলেন—আমি মুখের কথা বলিলেই রোগ যাইবে ? আচ্ছা আমি একটা বাক্য ব্যয় করিলেই যদি তোমরা তুষ্ট হইয়া যাও, তবে তাহাতে আমি নারাজ হইব কেন ? এইত বলিতেছি—উহার রোগ দূর হউক, রোগ দূর হউক, রোগ দূর হউক। এখন তুষ্ট হইলে ত ? তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও'। আমি এই সকল ব্যবহার দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—তিনি

রোগীর রোগ নিজে লইয়া অল্পকাল ভোগ করিতেন, তাহাতেই রোগ যাইত। কিন্তু দেখিতাম, তিনি কাহারও রোগ লইয়া ভুগিলেন না, অথচ রোগীরা রোগমুক্ত হইল। তখন আমি কিছুই মর্ম্মোদ্ধার করিতে না পারিয়া, রোগীদের পক্ষ হইয়া বলিলাম— 'রোগীরা এখানে আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার কে? তোমার মনে তুমি থাক, রোগীদের মনে রোগীরা থাকুক, তোমার এত আপত্তি কেন?' লোকনাথ বলিলেন— 'উহারা যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার শরণাপন্ন হয়, তাহাতে আমি সুস্থির থাকিতে পারি না; উহাদের দুঃখ দেখিয়া অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া যায়; অতএব উহাদের দুঃখে আমারও দুঃখ বোধ হয়।' আমি বলিলাম—'তুমি রোগীর রোগ নিজে লওনা দেখি, অথচ রোগীরা আরোগ্য লাভ করে কিরূপে?"

উত্তর। রোগীর উপর আমার দয়া আসিলেই আমার শক্তিদ্বারা রোগ দূর হইয়া যায়।

প্রশ্ন। তোমার দয়া হয় কি করিলে?

উঃ। আমাকে তুষ্ট করিলে।

প্রঃ। তুমি তুষ্ট হও কিসে?

উঃ। তাহা আমি জানিনা ও বলিতে পারি না।

রুগ্ন অবস্থায় তাঁহার নিকট যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা প্রায়ই মৃতকল্প ও ডাক্তার কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগী। রোগীরা যখন বহু চেষ্টা করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্যলাভে নিরাশ হইয়াছে, তখনই তাঁহার শরণাপন্ন

হইয়াছে। আমরা এইরূপ কয়েকটী রোগীর বিবরণ যাহা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইতে পারিয়াছি এস্থলে তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। কলিকাতাস্থ হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন বাবু সীতানাথ দাস বাতব্যাধিগ্রস্থ হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও যখন ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না, তখন জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বারদী আসিয়া ভক্তি সহকারে ব্রহ্মচারিবাবার পদে আশ্রয় লইলেন এবং কিছুকাল তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া তদীয় কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়া কেবল তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করতঃ অচিরে উৎকট রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া যান।

২। ঢাকা নগরের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী পানিয়াগ্রামনিবাসী বাবু রাধিকামোহন রায় মহাশয় বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অচল অবস্থায় কালযাপন করেন। কবিরাজী ও ডাক্তারী প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসা করাইয়াও যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন বারদী যাইয়া ব্রহ্মচারিবাবার আশ্রমে পড়িয়া থাকেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া প্রসাদ পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন। প্রসাদভক্ষণের পর হইতেই কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষে রোগমুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনা তাহার ঢাকাবাসী বন্ধুগণ সকলেই অবগত আছেন।

৩। বারদীর অন্যতম জমীদার বাবু কাশীকান্ত নাগ মহাশয় ঢাকাস্থ ছোট বড় অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। তিনি ঢাকাতে

মুনসেফ্ কোর্টে ওকালতী করিতেন। এক সময়ে কঠিন উদরাময় রোগে তাহার জীবন সংশয়িত হইয়া পড়ে। কোনরূপ চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। শরীর জীর্ণশীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া যায়। দাঁড়াইবার বা বসিবারও শক্তি ছিল না। মলধারণের শক্তি এককালেই লুপ্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় কাশীবাবু সস্ত্রীক বারদীর বাবার আশ্রমে যাইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর জীবনের জন্য বাবার চরণে পড়িয়া অতি কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বাবার হৃদয়ে কৃপার উদ্রেক হইল। সেই সময়ে বাবার পার্শ্বেই কোন ভক্তের প্রদত্ত একটা বৃহৎ আনারস বিদ্যমান ছিল। বাবা রোগীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"আনারস খাইতে ইচ্ছা হয় ?" রোগী কিছু না বলিয়া সতৃষ্ণ নয়নে আনারসের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখন বাবা পরিচারকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন—"এই আনারসটা কাটিয়া এই নাগ বাবুকে খাইতে দাও"। আদেশমতে রোগীকে আনারস খাইতে দেওয়া হইল। রোগী বহুদিনের উপবাসীর ন্যায় সেই বৃহৎ আনারসটা সম্পূর্ণ উদরস্থ করিলেন। তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও উদর হইতে নিঃসৃত হইল না। সেই হইতেই রোগীর সুদীর্ঘ কালের জীবনসংশয় উদরাময় (গ্রহণী) চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। (এই ঘটনা ঢাকাস্থ কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ৺ রজনীকান্ত আমীন বেদান্তবাগীশ মহাশয়, কাশীবাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়ের

মুখে শুনিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন)। বাবা ঔষধ প্রদানের ভার কবিরাজকে দিয়া, পথ্য বা কুপথ্য দিবার অধিকার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন।

৪। আমার সুপরিচিত ও বিশ্বস্ত বন্ধু, ষোলঘর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—"আমার ভ্রাতা রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়েন। প্রায় ২২।২৩ বৎসর অতীত হইল আমরা তাঁহাকে লইয়া বারদী গমন করি। রাধাচরণের পত্নীরও মৃতবৎসাদোষ ছিল, তিনিও এই সঙ্গে বারদী গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীর আশ্রমের প্রাঙ্গণের দক্ষিণপার্শ্বে একটী বিল্ববৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের নীচেই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাধাচরণ কয়েক দিন তথায় থাকিয়া ব্রহ্মচারিবাবার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে বিনা ঔষধেই সেই অসাধ্য রোগের করাল কবল হইতে সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইল। রাধাচরণের সহধর্ম্মিণীও আশ্রম হইতে প্রত্যাগত হইবার পরেই ক্রমে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তাহারা সকলেই তাঁহার কৃপায় এযাবৎ জীবিত আছে। মৃতবৎসার দোষ আর তাঁহাকে এযাবৎ স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

বারদীর ব্রহ্মচারীর কথামাত্র রোগীর রোগ দেহ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। আমরা এই সম্বন্ধে শত শত ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। তবে যেগুলি বিশ্বাসযোগ্য, সত্যনিষ্ঠ লোকের মুখে শুনিয়া জানিতে পারিয়াছি, পাঠকদিগের প্রত্যয়ের জন্য তাহারই কয়েকটী ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

নিম্নলিখিত ঘটনা কয়টী ঢাকার পেন্‌সেন্‌প্রাপ্ত ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর মহাশয় নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া স্বহস্তে লিখিয়াছেন :—

"আমি আমার রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া ব্রহ্মচারিবাবার নিকট যাই। তখন রোগিণীর বাগ্‌বোধ হইয়াছে, আহার নাই, নিদ্রা নাই, এরূপ অবস্থা যে আহার মুখে দিলে থুঁথুঁ করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। ডাক্তারী, কবিরাজী প্রভৃতি অনেক চিকিৎসার পর শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতিও অনেক করাইয়াছিলাম, কিছুতেই কোন ফল না হওয়ার পর বাবার নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে স্ত্রীকে সমর্পণ করিলাম। দিনের বেলায়ই বারদী যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং দিন থাকিতেই অনেক কথার পর * বাবা

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বাবু যখন তাহার স্ত্রীকে নিয়া বাবার নিকট উপস্থিত হন তখন বাবার অন্যতম প্রিয়শিষ্য মহাত্মা পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সেরেস্তাদার) মহাশয় বাবার চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এখানে লিখা হইয়াছে "অনেক কথার পরে" কিন্তু কি কি কথা বলা হইয়াছিল বলা হয় নাই। চন্দ্রকুমার বাবুর সঙ্গে বাবার এই সময় বড়ই একটী ভাল কথা হইয়াছিল। তাহা আমরা উক্ত পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। ঐ কথাটী উল্লেখ করিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার বাবুর ব্যগ্রতা ও আগ্রহ দেখিয়া বাবা বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ হইয়াছি কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বাক্যদ্বারা চৌরানব্বইটী উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছি; এইক্ষণ আর আমার সেই স্পৃহা নাই। যদি কেহ ইচ্ছা করাইয়া নিতে পারে তবে এখনও আরোগ্য হয়।" ইহার পরে চন্দ্রকুমার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইচ্ছা করাইয়া নেয় কিপ্রকারে?" ইহার উত্তরে বাবা বলিয়াছিলেন, "ক্ষুৎ নিবারণের জন্য দেহের যেরূপ প্রয়োজন বোধ, বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগের জন্য দেহের যেমন প্রয়োজন বোধ, ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন বোধ যার আমার জন্য থাকে, সে এখনও আমার ইচ্ছা করাইয়া নিতে পারে।"

বলিলেন—'রাখিয়া যাও।' সে যাত্রায় ভাল নৌকা সঙ্গে না থাকায় অনুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম এবং ভাল নৌকা ভাড়া করিয়া লোকজন সঙ্গে দিয়া ৫।৭ দিনের মধ্যেই বারদী পাঠাইলাম। সঙ্গে খাওয়ার জিনিস পত্র সকলই দিয়া দিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি বাবার আশ্রমেই প্রসাদ পাওয়ার আদেশ হইল। এই সময়ে স্ত্রী কিছুই খাইতেন না। সেই অবস্থায় তিন মাস তথায় বাস করিলেন। ইতিমধ্যে আমি দুই তিন বার তথায় গেলাম। পূজার ছুটীতেও তথায় গিয়াছিলাম। তখন পুত্র প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া যাই। এই সময় আমার ছোট পুত্রের বয়স ৪ বৎসর। মধ্যম পুত্রের আমাশয়ের ব্যারাম ছিল। এই যাত্রায় গিয়া দেখিতে পাইলাম স্ত্রী বড় স্বরে কথা বলিতেছেন। নৌকার মধ্যে ও বাহিরে এবং নদীতীরে প্রায় দুইশত লোক একত্র হইল এবং বোবায় কথা কহিতেছে দেখিযা সকলেই যার পর নাই বিস্মিত হইল। রাত্রিতেই গোসাঁইর আশ্রমে চলিয়া গেলাম। গোসাঁই ঘরের অভ্যন্তরে ছিলেন; ডাকিয়া অবস্থা জানাইয়া, এখন কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয়ে অনুমতি চাহিলাম। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই বলিলেন—'নিয়া যাইতে চাইস্'? উত্তরে বলিলাম—'তোমার উপরে নির্ভর, তুমি যা বল তাই করিব'। (বলা বাহুল্য তিনি আমাকে 'তুই' বলিয়া এবং আমি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া বলিতাম।) তখন তিনি বলিলেন—'একথাও কথা নয়, কাল হয়ত এত কথা থাকিবে না। আরও কয়েক দিন রাখিয়া যা।' তদনুসারে আমি তাঁহাকে তথায়

রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর তিনি একমাস বাবার আশ্রমে ছিলেন, একমাস অতীত হইলে তাঁহার আদেশানুসারে বাড়ী লইয়া আসি। তখন তিনি অল্প অল্প কথা বলিতে পারিতেন। বাবা বলিয়া দিয়াছিলেন ক্রমেই কথা স্বাভাবিক হইবে। তাঁহার আদেশ মতে পরে কথা স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্যারামের কোন চিহ্নও ছিল না. কিন্তু ইদানীং হঠাৎ আবার সেই ব্যারাম উপস্থিত হইয়াছে! গোসাঁই বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁহার নামেই আছেন, কোন রকম চিকিৎসা করাইতেছি না।

যে পুত্রের আমাশয় ব্যারাম লইয়া যাই, তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন—'তোর ঐ রোগা ছেলে আমার এখানে প্রসাদ পাইবে, তোদের কোন জিনিষ ইহাকে খাওয়াইস্ না।' দুইদিন প্রসাদ খাইয়াই আমাশয় সারিয়া গেল, আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হইল না।

উহাকে যখন ব্রহ্মচারীর নিকট রাখিয়াছিলাম তখন আবার আমার ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্রটীর হঠাৎ ভয়ানক জ্বর হইল। প্রথম দিন বাবাকে কিছুই বলি নাই। কাহারও নিকট হয়ত উহার জ্বরের কথা শুনিয়া থাকিবেন, তাই পরদিন প্রাতে আমাকে গালি দিয়া বলিলেন—'তোর ছোট ছেলের জ্বর হইয়াছে, আমার নিকট বলিস্ নাই কেন?' আমি উত্তর করিলাম—'তুমি রোগা দেখিলেই চট, তাড়াইয়া দেও, যাহার আরাম হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে (আমার স্ত্রীকে) তোমার চরণে ফেলিয়া রাখিয়াছি;

পাছে ছেলের কথা বলিলে রাগ কর। জ্বর তো চিকিৎসা করিলেই সারিতে পারে।' তিনি গালি দিয়া বলিলেন—'উহাকে আমার নিকটে আন্।' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওকে খাওয়াইস্ কি ?' আমি বলিলাম—'সাগু'। পরে উহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং কহিলেন—'সাগু খাওয়াইস্ না'; এ ওর মায়ের সঙ্গে এখানেই খাইবে, সে ওকে খাওয়াইয়া দিবে।' আমার তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ছিল, তাই বিশ্বাস করিলাম—ভাত খাইলে কোন অনিষ্ট হইবে না। দেখিলাম মটরের দা'ল চাল্‌তা কি জলপাই দিয়া পাক করিয়াছে, তা দিয়া আতপ চাইলের ভাত খাওয়াইল (আতপ চাউল ভিন্ন অন্য চাউল তথায় পাক হইত না)। গোসাঁই তখন সাক্ষাতেই ছিলেন, বলিলেন—'বিকালে এই পথ্য খাইবে, ইহাকে সাগু খাওয়াবি না, যাহা হয় আমার এখানেই খাওয়াইবি।'

সেইদিন বিকালে জ্বর বাড়িল, বাবাকে বলিলাম—'জ্বর বাড়িয়াছে।' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'কাল আর জ্বর থাকিবে না, ভয় পাইস্ না। বিকালেও আমার এইখানেই খাইবে, তোর নৌকার কিছুই খাওয়াইবি না।' বিকালেও সেখানে খাইল, পর দিবস সকালে দেখিলাম জ্বর নাই। জিজ্ঞাসা করাতে বাবাকে বলিলাম—জ্বর নাই। পরদিনও সেখানে খাইল। বাবা বলিলেন—'ইহাকে কুইনাইন্ টুইনাইন্ খাওয়াইস্ না, ভাতই খাইবে।' বাস্তবিক ইহাতেই ছেলেটী রোগ মুক্ত হইল।

শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত।

ঢাকা জিলায় মানিকগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নামক একজন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্‌ও এক সময়ে অসাধ্য মহারোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য বিষয়ে বিফলমনোরথ এবং জীবনাশায় নিরাশ হইয়া অবশেষে বারদী যাইয়া ব্রহ্মচারি-বাবার পদযুগল আশ্রয় করেন এবং তাঁহার কৃপায় ও অলৌকিক প্রভাব বলে অবিলম্বে রোগমুক্ত হইয়া বন্ধুবর্গের নিকট তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিয়া সেই অপরিশোধ্য উপকার ও ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিয়াছিলেন। (ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই বৃত্তান্তটী আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।)

চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন—"একদা আমি ঢাকা নগরে বুড়ীগঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম ডেপুটী বাবু সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা মাখাইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিগো ডেপুটী বাবু! আপনার এ দশা কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"আমি দারুণ মহাব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইয়া বারদীর মহাত্মা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়াছিলাম। মহাপুরুষের কৃপায় সেই উৎকট ব্যাধি হইতে এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন—কয়েক দিন গায়ে মাটি মাখিয়া বসিয়া থাকিও, তাহা হইলে পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকিবে না। তাই মহাত্মার মহায়সী শক্তির কথা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইতে পারে এইজন্য মাটি মাখিয়া প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া থাকি। অবিশ্বাসী শ্রদ্ধাবিহীন

বহির্মুখ লোকেরা জানুক যে এখনও ভারতে ঈদৃশ অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাবানের নেত্রেই প্রকট হইয়া থাকেন।”

ব্রহ্মচারীর আশ্চর্য্য মহিমা ও ঐশীশক্তির পরিচায়ক এইরূপ যে কত শত ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

ঢাকা জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট উকীল এবং ঢাকা কলেজের আইনশিক্ষার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, বাহাদুর ব্রহ্মচারিবাবার সম্বন্ধে “মহাত্মা বারদীর ব্রহ্মচারী”—শীর্ষক যে একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের নিকট উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা অতঃপর লিখিত হইল।

মহাত্মা বারদীর ব্রহ্মচারী।

“বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ত্রিকালদর্শিতা ও অন্তর্য্যামিত্বে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন অথবা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। মহাত্মা লোকনাথ ব্রহ্মচারিবাবার অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত কার্য্যকলাপ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আমার যে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের তাদৃশ অবিশ্বাস ও সংস্কার যে নিতান্তই অমূলক ও ভ্রমাত্মক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে আমরা আমাদের এই প্রতীতির প্রতিপোষক কয়েকটী ঘটনার কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

অন্যূন ৩৩ বৎসর অতীত হইল, একদা পৌষ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী কি চতুর্দ্দশী দিন, আমি ও আমার বন্ধু ও আত্মীয় মৃত বাবু মহেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় (১) বারদীর উক্ত মহাপুরুষের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাই। মহাত্মা হয়ত পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই হউক, কি অন্য যে কারণেই হউক, আমাদিগের সহিত আলাপে প্রথমে অতি কঠোর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই আবার নিরতিশয় দয়া ও সদ্ব্যবহার দেখাইতে লাগিলেন। আমরা সমুদয়ে প্রায় ৯।১০ জন লোক ছিলাম, সকলকেই যত্নপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে আহার করাইলেন। আহারের সময় আমাকে বৃহৎ একবাটী দুগ্ধ ও ঈষৎ অপক্ক কয়েকটা 'সুরভী' (সভরি) কলা খাইতে দেওয়াইলেন। আমার তখন উদরাময় রোগ ছিল। কিন্তু মহাপুরুষ সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকাতে, আমি ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য উপেক্ষা না করিয়া সমস্তই ভোজন করিলাম। মনে করিলাম—যখন মহাপুরুষের নিকট আসিয়াছি, তখন কোনও অসুখ না হইবারই সম্ভাবনা। আহারের পরে, আশ্রমস্থিত একটী বিল্ব বৃক্ষের নিম্নে একজন বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী, তাহার সঙ্গের লোকজন সহ, যে শয্যাতে উপবিষ্ট ছিল, তাহারই একপ্রান্তে বসিয়া পান খাইলাম। সেই সময়ে আমার মনে এই কথার উদয় হইল—আমরা যখন এতগুলি লোক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে

(১) ইনি ভুকৈলাসের রাজাদিগের জমিদারী বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

আহার করিলাম, তখন ইঁহাকে কিছু দেওয়া নিতান্তই সঙ্গত। সামাজিক নিয়মানুসারেও কোন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খাইতে হইলে আমার শ্রেণীর লোক প্রণামী স্বরূপ কিছু দিয়া থাকে। এইরূপ আলোচনা করিয়া পকেট হইতে ৪৷৫ টাকা প্রণামী উক্ত মহাত্মাকে দেওয়ার জন্য সঙ্কল্প করিলাম এবং সেই অভিপ্রায়ে তথা হইতে উঠিয়া পুনরায় উক্ত মহাত্মার নিকটে গিয়া বসিলাম। মহাপুরুষ তখন ঐ বিল্ববৃক্ষের সম্মুখস্থিত অঙ্গনের অপর প্রান্তে একখানি ছোট কুঁড়ের ঘরের অভ্যন্তরে বসিয়াছিলেন। আমি যাওয়া মাত্রই অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ আমার মনের উক্ত সঙ্কল্প জানিতে পাইয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'উকীল বাবু! তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিয়া যে খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদ কর, সেই সকলই তোমাদের জিনিষ দ্বারাই হইয়া থাকে, ইহার কিছুই আমার নহে। এমন কর্ম্ম করিও না, এমন ভাব দেখাইও না, যাহাতে কেনা বেচা হয়!' এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, বিল্ববৃক্ষের নীচে বসিয়া আমি মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়াছি অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ নিশ্চিত তাহা জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহাই করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছেন।

অতঃপর সেই দিন মহাত্মার সহিত আলাপ করিতে করিতে প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি হইল। পৌষ মাস কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রি, চতুর্দ্দিক ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমাদের সহিত দুইটী লণ্ঠন ছিল। আমরা চলিয়া আসিবার অনুমতি চাহিলাম। মহাপুরুষ শুনিয়া বলিলেন—'মেঘনা নদীর ঘাটে তোমাদের

নৌকা, এখান হইতে যদিও ১৫ পনর মিনিটের বেশী ব্যবধান নহে, তথাপি সঙ্গে একজন লোক দি ; হয়ত তোমরা পথ ভুলিয়া যাইতে পার।' আমরা বলিলাম—আমরা ৯।১০ জন লোক, সঙ্গে দুইটা লণ্ঠন আছে, বারদী ছাড়িয়া গেলেই সম্মুখে ছোট একখানা মাঠ, তার পরেই নদীর ঘাট ; লোক সঙ্গে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখিনা ; আমাদের জন্য আপনার (মহাত্মার) কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। আমাদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নানা কথায় অবকাশে, তিনবার আমাদের সঙ্গে লোক দেওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আমরা কোন মতেই তাহা স্বীকার করিলাম না। ইহার পর আমরা তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বারদী গ্রাম অতিক্রম পূর্ব্বক সন্নিহিত অনাবৃত ভূমিতে (মাঠে) যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মাঠে নামিয়া বোধ হয় ৫০।৬০ হাত মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, অমনি আমাদের সকলেরই যুগপৎ এমন দিগ্ভ্রম জন্মিল যে কোথায় যাইব দক্ষিণ দিকে, তাহা না করিয়া, ক্রমে পূর্ব্বোত্তরমুখ হইয়া চলিতে থাকিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ লোষ্ট্র সমূহে নিরন্তর সমাকীর্ণ কৃষ্টভূমি (চষাক্ষেত) সকল পার হইয়া একস্থানে একটা আলো দেখিতে পাইলাম। একবার মনে হইল আলোটা কোনও নৌকার হইবে। পরক্ষণেই আবার সারি সারি কতকগুলি আলো দেখিয়া বোধ হইল, সেগুলি কোনও মিঠাই দোকানের আলো হইবে। তখন আমরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া সঙ্গের ২।৩টী লোককে

একটা লণ্ঠন সহকারে উহাদের নিকটে যাইয়া ঐ সকল আলো কিসের দেখিতে বলিলাম। তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই চীৎকার করিয়া বলিল — তাহারা সম্মুখে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। তথাপি প্রায় এক ঘণ্টার অধিককাল সেই দিকেই হাঁটিয়া সম্মুখে অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলের মত কিছু অনুভব করিতে লাগিলাম। অতঃপর মানুষের কথা বার্ত্তার ন্যায় একটা শব্দ শুনিয়া গ্রামবোধে শব্দানুসারে তত্রত্য লোকদিগকে ডাকা ডাকি করিয়া পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাহাদের মধ্যে দুই এক জন লোক আলো সহকারে বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমরা কোথায় যাইবে ?' আমরা উত্তর করিলাম—'বারদীর ব্রহ্মচারীর আশ্রম হইতে আসিয়াছি, মেঘনার ঘাটে যাইব।' আমাদের উত্তর শুনিয়া তাহারা কহিল—'কোথায় বা বারদী ! আর কোথায় বা মেঘনার ঘাট ! আর কোথায় বা আপনারা আসিয়াছেন ! আপনারা বারদীর বহুদূরে (প্রায় এক ঘণ্টা দূরে) উত্তর পূর্ব্বদিকে একগ্রামের নিকটে আসিয়াছেন। ইহার নিকটেই বাঘাই জঙ্গল !' অতঃপর তাহারা আমাদিগকে তাহাদের বাটিতে লইয়া যাইয়া বিশ্রাম করাইল এবং একজন লোক দিয়া আমাদিগকে মেঘনার ঘাটে নৌকাতে পঁহুছাইয়া দিল। আমরা সেই রাত্রিতে নৌকায়ই শয়ন করিয়া রহিলাম। পর দিন প্রত্যূষে নৌকা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলাম।

আশ্রমে যাইয়া দেখি—মহাপুরুষ এই মাত্র তাঁহার ঘরের

দ্বার খুলিয়াছেন। দ্বার খুলিয়াই আমাদিগের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন—'কেমন উকিল বাবু! তোমরা না বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য আমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না? গত রাত্রিতে আমি তোমাদিগকে তিনবার বলিলাম—সঙ্গে লোক দি, তিন বারই তোমরা আমার কথা উপেক্ষা করিলে। গত রাত্রিতে কোথায় গিয়েছিলে? মিঠাইয়ের দোকানের আলোর মত আলোগুলি কেমন দেখিয়াছিলে? বাঘাই জঙ্গলে যাইয়া পড়িয়াছিলে নয়? আমিও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম, কোন বিপদ ঘটিত না ইত্যাদি ইত্যাদি।' ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইল মহাত্মা যেন ঠিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ ও হতবুদ্ধি হইলাম এবং তাঁহার অমানুষী শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, মহাত্মার কৃপায় সেই হইতেই আমি বহুদিনের উদরাময় (বাতাজীর্ণ) রোগ হইতেও অব্যাহতি পাইলাম।

আর একবার আমি ও আমার বন্ধু ঢাকা জজকোর্টের উকিল মৃত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুইজন এক সঙ্গে ঢাকা হইতে বারদী যাওয়ার সময়ে কয়েকটা ফল খরিদ করিয়া নেই। যাইবার সময়ে পথে আলাপ করিলাম—ব্রহ্মচারীর নিকট ফলমূল যাহাই কেন উপস্থিত করিনা, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিরাই গ্রহণ করিয়া ভোগ করে। দুঃখের বিষয় এই যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং তাহার

কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আক্ষেপ ঢাকাতে এবং নৌকাপথে উভয় স্থানেই করিয়াছিলাম। পরে বারদী যাইয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রমে উপস্থিত হইলে, আমাদের আনীত ফলগুলি ব্রহ্মচারীর সম্মুখে রাখিলে পর, তাহা তাঁহার ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল। কিছুকাল আলাপের পর ব্রহ্মচারী মহাশয় আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন—'আমি যাহা ইচ্ছা করি, আমি যাহা খাইতে চাই, তাহা আমাকে কেহই দেয় না।' আমি এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবা! আপনি কি ইচ্ছা করিয়াছেন? কি খাইতে চাহেন?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন—'এই যে তোমরা ফল আনিয়াছ তাহা আমার স্বয়ং খাইবার সাধ হইয়াছে। তাহা আমাকে কেহই কাটিয়া দিতেছে না'। আমরা তখন ঐ ফলগুলি কাটিয়া ব্রহ্মচারী বাবাকে খাইতে দিলাম। তিনি তাহা হস্ত ও জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে প্রসাদ দিলেন। তখন আমরা নিশ্চিতই বুঝিলাম আমাদের মধ্যে নৌকা পথে যে কথোপকথন হইয়াছে, অন্তর্য্যামী ব্রহ্মচারিবাবা তাহার সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন।

ব্রহ্মচারিবাবা আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার মাকে (এক বৃদ্ধা গোপতনয়া, যাঁহাকে তিনি মা বলিয়া ডাকিতেন) বলিলেন—'মা! ইহারা ছেলে মানুষ, ১০ টার সময়ে খাওয়ার অভ্যাস, ইহাদের জন্য সকালে পাক কর।' তৎপরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'এই

ছেলেটী শাক বড়ই ভালবাসে, ইহার জন্য শাক প্রস্তুত করিবে।' আমি কি খাইতে ভালবাসি ব্রহ্মচারিবাবার ইতঃপূর্ব্বে তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অন্তর্য্যামী মহাপুরুষ আমি যাহা খাইতে ভালবাসি, তাহাই প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। পাক সমাপ্ত হইলে আমরা তাহা যথেষ্ট আহার করিলাম।

এইরূপ অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, যাহাতে এই মহাপুরুষের অন্তর্য্যামিত্ব প্রকটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও যে যে ঘটনা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পাইয়াছি তাহাও নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ব্রহ্মচারিবাবা স্থূল দেহে বারদীতে থাকিয়া অনেক সময়ে সূক্ষ্মদেহে অতীব দূরবর্ত্তী স্থানেও গমন করিতেন। একবার স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বারবঙ্গে (দ্বারভাঙ্গায়) যাইয়া জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিন ব্যাপিয়া অচেতন ও বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া থাকেন। ঐ অবস্থা হইতে যখন সংজ্ঞালাভ করিলেন, তখন প্রথমেই এই কথা বলিয়া উঠিলেন—'বারদীর ব্রহ্মচারী ও রামকৃষ্ণ পরমহংস আসিয়া তাঁহাকে নীরোগ করিলেন।' সেই সময়ে বারদীর ব্রহ্মচারী সূক্ষ্মদেহে দ্বারবঙ্গে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসেন এবং তাঁহার গায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা গোস্বামী মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এক সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের মনে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে তিনি দ্বারভাঙ্গাতে ব্রহ্মচারীকে যে নিকটে দেখিতে পাইয়াছিলেন, উহা কি বাস্তবিক সত্য, অথবা জ্বরজনিত

মস্তিষ্কের বিকৃতিহেতু মিথ্যা দর্শন অথবা স্বপ্নমাত্র আরোগ্য লাভের পর এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য একদা তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সপরিবারে বারদী গিয়াছিলেন লোকনাথ বলিলেন তোমাকে ঘরে দেখিতে পাইলাম না'। গোস্বামীপ্রভু বলিলেন 'আমার গুরু আমাকে দেহ হইতে বাহির করিয়া নিয়াছিলেন।'

দেয়ারা স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট মৃত পাববতীচরণ রায় মহাশয়ও একবার হাজারিবাগে কোনও উৎকট রোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মচারিবাবাকে তথায় দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং কৃপার চিহ্নস্বরূপ শরীরে তদীয় হস্তপরামর্শ অনুভব করিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ও এসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বারদী আগমন পূর্ব্বক বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা আমি অতি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারিবাবা আমাকে কয়েকটা উপদেশও করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আমি যখন ব্রহ্মচারিবাবার সহিত আলাপ করিতেছি, তখন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"বাবা! আমাদের গুরুকুলে পুরুষ শ্রেণীর মধ্যে এমন কেহ বিদ্যমান নাই, যাঁহার নিকট হইতে আমি মন্ত্রগ্রহণ করিতে বা তত্ত্বোপদেশ পাইতে পারি। আমি কিছু ধর্ম্মোপদেশ চাই।"—তাহা শুনিয়া ব্রহ্মচারিবাবা বলিলেন—

ব্রহ্মচারিবাবা। 'সাংসারিক লোকের হেল না হওয়ার কারণ কি ?'

আমি। যদি আয় ব্যয় বিচার করিয়া চলে।

ব্রহ্ম। আয় ব্যয় বিবেচনা করার নাম কি ?

আমি। কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

ব্রহ্ম। জমাখরচ রাখা। তুমি কর্ম্মের জমাখরচ রাখিতে পার ?

আমি। কর্ম্মের জমা খরচ কি, বুঝিতে পারিলাম না।

ব্রহ্ম। তুমি উকীল হয়েও কেন অত বোকা হইলে ?

আমি। বাবা! বুঝাইয়া দিন্।

ব্রহ্ম। তোমরা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মই করিয়া থাক। রাত্রিতে শুইবার সময়ে চিন্তা করিবে অদ্য কতটা সৎ ও কতটা অসৎ কর্ম্ম করা হইল। সৎকর্ম্মগুলি—জমা আর অসৎকর্ম্মগুলিই—খরচ। অসৎ কর্ম্মের ভাগ বেশী হইলেই খরচ বেশী হইল। সৎকর্ম্মের ভাগ বেশী হইলে জমার দিকে বেশী হইবে। প্রথম দিন এই প্রকার হিসাব করিয়া শুইয়া থাকিবে। পরদিন আবার এইপ্রকার চিন্তা করিবে, দেখিবে কোন্ ভাগ বেশী হয়। প্রথম দিনে অসৎকর্ম্মের ভাগ বেশী হইলে, পরদিন যখন কর্ম্ম করিতে থাকিবে তখন অসৎকর্ম্ম যাহাতে বেশী না হয় তৎপ্রতি তোমার দৃষ্টি থাকিবে। এইরূপ ছয় মাস কাজ করিতে পারিলে, ক্রমেই অসৎকর্ম্ম কমিয়া যাইবে এবং সৎকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। পরে ছয় মাস অন্তে দেখিতে পাইবে, বহু কষ্টে, বহু সাধন করিয়া, যোগী সন্ন্যাসী

যাহা লাভ করিতে পারে, তুমি অল্প দিনেই অল্পায়াসে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। ইহাই তোমার প্রতি আমার একমাত্র উপদেশ। এই উপদেশ অনুসারে চলিতে থাক। একমাস অন্তে পুনর্ব্বার আমার নিকট আসিবে।

মহাত্মা ব্রহ্মচারীর নিকট আমি এই উপদেশ পাইয়াও সাধনমন্ত্র লাভের জন্য পত্রদ্বারা বারংবার প্রার্থনা জানাই। প্রার্থনা পত্রগুলিতে বহুল যুক্তিপরম্পরা ও কারণ সমূহ প্রদর্শন করি। কিন্তু মহাত্মা ব্রহ্মচারী তাঁহার দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে এই তিনটী শব্দমাত্র বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন 'মন্ত্রণা মন্ত্র না'। মহাত্মা ব্রহ্মচারী আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও এক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচারিবাবার প্রিয়শিষ্য পেন্‌সনপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত মদনমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বারদীতে ব্রহ্মচারীর আশ্রমের প্রাঙ্গণে বিল্ববৃক্ষের নীচে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন দিবাভাগে হঠাৎ আকাশমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল। থাকিবার অন্য স্থান বা অন্য ঘর না থাকাতে প্রবাসীরা মেঘের আয়োজন দেখিয়া কি

উপায় হইবে ভাবিয়া যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রহ্মচারীর কি অদ্ভুত প্রভাব! বিল্ববৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে মুষলধারায় বর্ষণ হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কৃপায় বিল্ববৃক্ষের নিম্নস্থ যাত্রীদিগের গাত্রে একবিন্দু জলও পতিত হইল না।"

ব্রহ্মচারিবাবার অন্যতম শিষ্য, জগন্নাথ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মৌলিক মহাশয় বলিয়াছেন—"ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল মৃত বাবু রমাকান্ত নন্দী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পুলিশ ইনস্পেক্টার বাবু কালীকান্ত নন্দী একবার আমার সহিত মিলিত হইয়া বারদী গমন করেন। আমরা উভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া বাবার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলাম। আহারের সময় উপস্থিত হইল। আমরা মহাপুরুষের আশ্রমে বসিয়া পরস্পর নানা কথাবার্ত্তা বলিতেছি, এমন সময় হঠাৎ মনে এক খেয়াল হইল, এ অকাল, এ সময়ে পাকা কাঁটাল পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিব বাবার কেমন মহিমা, এই অকালে পাকা কাঁটাল দ্বারা আমাদিগের আতিথ্য করিতে পারেন কি না? এই আলাপ হইবার ঘণ্টা দুই পরেই আশ্রমের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, একব্যক্তি এক সুবৃহৎ পরিপক্ক কাঁটাল মস্তকে করিয়া বাবাকে উপহার দেওয়ার জন্য আশ্রমের অভিমুখে চলিয়া আসিতেছে। আগন্তুক কাঁটালটীকে বাবার গৃহের দাওয়ায় রাখিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তখনই চলিয়া গেল। কিছুকাল পরেই বাবা পরিচারকদিগের কাহাকেও ডাকিয়া কহিলেন, এই কাটালটাকে এখনি ভাঙ্গিয়া ঐ ভদ্রলোক

ছটাকে খাইতে দাও। ইহারা যথেষ্ট ভক্ষণ করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, আশ্রমের অন্য সকলকে বাঁটিয়া দিও।"

বাবার উক্ত শিষ্যটী আরও বলিয়াছেন—"একদা আমরা কয়েকজন বাবার নিকটে বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে বাবা হঠাৎ যেন কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া অকথ্য গালাগালি করিতে লাগিলেন। আমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম আমাদের মধ্যে কে এমন অপরাধ করিল, যে বাবা তাহাকে এমন ভাবে ভৎর্সনা করিতেছেন। কতক্ষণ পরেই দেখি, একটী অপরিচিত ব্রাহ্মণ আসিয়া বাবার একপাশে দাঁড়াইয়াছে। বলাবাহুল্য ইতিপূর্ব্বে সে কখনও আশ্রমে আসে নাই। বাবা তাহাকে দেখিয়া দ্বিগুণতর ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবার এই কার্য্য দেখিয়া আমরা অবশ্য একটু দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ তখনই তাহার ভৎর্সনা সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। বাবা কহিলেন এই বামুনের একটা বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। ঐ কন্যার পণ বাড়াইয়া বামন ক্রমে ক্রমে ৮০০ শত টাকায় উঠাইয়াছে। আরও ২।১ শত টাকা বাড়িবে কিনা, জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল। এইজন্য এই নরমাংসবিক্রয়ী পাপিষ্ঠকে আমি গালাগালি করিয়া তাড়াইয়া দিলাম। আমরা ইহার সত্যতা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া পশ্চাৎ ঐ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, প্রকৃত পক্ষেই সে কন্যার পণ ৮০০ শত টাকায় চড়াইয়া আরও

দু একশত টাকা চড়িবে কিনা জানিবার জন্য বাবার নিকট আসিয়াছিল।”

বাবার পরমভক্ত অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চাকলাদার মহাশয়ও দুই একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(ক) “একবার আমার মাতার বুকে পিঠে তীব্র বেদনা জন্মে; তখন আমি বারদীতে বাবার আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলাম। আমার শ্যালক আসিয়া আমাকে খবর দেয়। আমি বাড়ী যাওয়ার জন্য বাবার নিকট অনুমতি চাহিলাম। বাবা বলিলেন—‘যা, বাড়ী চলিয়া যা, বাড়ী যাইয়াই মাকে বেড়াইতে দেখ্‌বি।’ আমি বাড়ী যাইয়া মাকে সুস্থ দেখিলাম। শুনিলাম মা ক্ষীর ও খই দিয়া পথ্য করিয়াও রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইহার পর মাকে সুস্থ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাবাকে সংবাদ বলিলাম। শুনিয়া বাবা বলিলেন—‘আমি তোদের বাড়ী গিয়াছিলাম, তোর মাকে ক্ষীর ও খই খাওয়াইয়া আসিয়াছি। তোর মা ভাল হইয়াছে বটে, কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ আগামী বৈশাখের পরবর্ত্তী বৈশাখে তাঁহার মৃত্যু হইবে।’ বলা বাহুল্য বাবার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল। তৃতীয় বৎসর বৈশাখ মাসেই মার মৃত্যু ঘটিল।

(খ) “আর একবার দেনার দরুণ ডিক্রীতে আমাদের কালীকিশোর চাকলাদার’ নামক হাওলা নীলামে উঠিল। নিরুপায় ভাবিয়া দৈববলের প্রত্যাশী হইয়া তৎক্ষণাৎ নিরতিশয়

ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতচিত্তে বাবার আশ্রমে চলিয়া আসিলাম, এবং বিপদের কথা বাবাকে নিবেদন করিলাম। আমার মুখে আদ্যোপান্ত সকল অবস্থা শুনিয়া নীলাম করাইতে আদেশ করিলেন, বলিলেন তোরই এক ভ্রাতা ডাকিয়া ডাক বাড়াইবে। নীলামের পর জানিলাম, আমারই গোমস্তা (যাহাকে আমি ভাই বলিয়া ডাকিতাম) অন্যের নামে একযোগে ১১২৫৲ টাকায় নীলাম খরিদ করিয়াছে। তখনই আবার এ সংবাদ বাবাকে জানাইবার জন্য বারদী যাত্রা করিলাম। ভোরের ট্রেন হারাইলাম। ৯টার ট্রেনে চড়িয়া নারায়ণগঞ্জ নামিলাম এবং তথা হইতে পদব্রজে লাঙ্গলবন্ধে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে সার্ভে স্কুলের ছাত্রগণ জরীপ অভ্যাস করিতেছিল। তন্মধ্যে কোলাগ্রামনিবাসী শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র আমার বিশেষ পরিচিত। তাহার অনুরোধে তথায় স্নানাহার সম্পাদনপূর্ব্বক তীরবেগে আবার বারদী অভিমুখে ধাবিত হইলাম। এই সময়ে বাবার অন্যতম শিষ্য এবং আমাদের গুরুভাই, মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী (১) ও অন্যান্য অনেক ভক্ত শিষ্যগণ আশ্রমে বসিয়া বাবার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। বাবা তাঁহাদিগের নিকট বলিলেন, ঢাকা হইতে একটা ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটিয়া আমাদিগের দিকে আসিতেছে। উপস্থিত

(১) এই শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই বাবার আশ্রমে যাইয়া আহার, নিদ্রা, প্রস্রাব সমস্তই বন্ধ রাখিয়া ৭দিন নয়রাত্রি একাসনে বসিয়া রহিয়াছিলেন। তিনি বাবার শক্তিপ্রভাবে বহুলোকের নানাবিধ অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন।

আলাপকারীরা একথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিয়ৎকাল পরেই আমি আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার মন যারপরনাই চঞ্চল, কতক্ষণে আসিয়া বাবাকে বিপদের কথা জানাইব এইজন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। অনুরোধে পড়িয়া একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাঙ্গলবন্ধে আহার করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ব্যস্ততা নিবন্ধন আধাপেটও ভোজন করিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই বলিলাম—"বাবা! তালুকত নীলাম হইয়া গেল; আমার ঋণও আদায় হইল না, এখন উপায় কি বল? ইহার মধ্যে কোন রহস্য থাকিলে বা এখনও কোন উপায় থাকিলে, আমার মাথায় পা দাও।" ব্রহ্মচারিবাবা আমার মাথায় পা দিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন- 'খাইস নাই, রে? আগে আহার কর,' এই বলিয়া মাকে ডাকিয়া বলিলেন, ঘরে খাওয়ার কি আছে দেখ! চাকলাদারকে খাইতে দাও! ঘরে চিড়া, দুধ ও সুরভি কলা ছিল, তাহাই আহার করিতে দিলেন— স্বয়ং মুখে স্পর্শ করিয়া আমাকে প্রসাদ দিলেন। আমাকে বলিলেন,"কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি দেখি। তোর নিলামী মহালের মহালতের দরখাস্তে ত উকীলের দস্তখত নাই; বেআইন নীলাম হইয়াছে, রদ হইবে।" ঢাকা আসিয়া দরখাস্ত তালাস করিয়া দেখিলাম—দরখাস্তে বাস্তবিকই উকীলের দস্তখত নাই। অথচ আমার উকীল চন্দ্রকুমার সেন মহাশয় আমার সাক্ষাতে স্বহস্তে পাসিতে দস্তখত করিয়াছেন, আমিই তাহাকে দিয়া দস্তখত করাইয়াছিলাম। যখন দরখাস্তে উকীলের দস্তখত দেখিতে

পাইলাম না, তখন বাবার অচিন্তনীয় মহিমার কথা চিন্তা করিয় ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। পরে নীলাম রদের প্রার্থন করাতে বেআইন বলিয়া নীলাম রদ হইল। কিন্তু দেন পরিশোধের কি উপায় হইবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পুনরায় বারদী আসিয়া, কি কর্ত্তব্য বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বাব উত্তর করিলেন—'যা, আবার যাইয়া নীলাম করা, ঋণশোধ হইয়া যাইবে'। পুনরায় মহাল নীলামে উঠাইলাম। বাবার কৃপায় ডাক বাড়িয়া এবার ভাগ্যকুলের জমীদার কুণ্ডবাবুদের গোমস্ত রূপচন্দ্র গুহ ৪৫০০৲ টাকায় নীলাম খরিদ করিলেন। তাহাতে দেনা শোধ হইয়াও নীলামের উদ্বৃত্ত ১০০০ হাজার টাকা আমার প্রাপ্য হইল। তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে বাবার অপার মহিমা ও নাম ধ্যান করিতে লাগিলাম। তাঁহার অসীম কৃপার কথা স্মরণ করিতে করিতে দুই নেত্র হইতে অজস্র আনন্দবারি বিগলিত হইয়া বক্ষ ভাসিয়া গেল।"

ঢাকা জুবিলী স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত আমীন মহাশয় বলিয়াছেন—"ঢাকার ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকীল বিখ্যাত গোকুলকৃষ্ণ সেন মুন্সীর পুত্র হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন সেন এম, এ, বি, এল মহাশয় একদা অন্য একজন ভদ্রলোক সহ বারদী গিয়াছিলেন। বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা আহার করাইয়াছিলেন। চন্দ্রমোহনবাবু আহার করিতে যাইবার প্রাক্‌কালে দেখিলেন—অতিথিদিগের ভোজনের নিমিত্ত গোয়াল

যে দধি দিয়াছিল, একটা বিড়াল আসিয়া চক্ চক্ করিয়া তাহার উপরিস্থিত কিয়দংশ খাইয়া ফেলিল। তিনি তাহা দেখিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—এ দধি কিছুতেই খাওয়া হইবে না। সকলে আহার করিতে বসিলে, দধি পরিবেশনের সময় আসিল। তখন বাবা পরিবেশনকারীকে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ, ঐ বাবুটীকে দধি দিও না।' চন্দ্রমোহনবাবু, নিজের হৃদ্গত সঙ্কল্প অন্তর্য্যামী ব্রহ্মচারী জানিতে পারিয়াছেন দেখিয়া, লজ্জা ভয়ে জড়সড় ও ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—'না, আমি দধি খাইব. খাইতে আমার কোন আপত্তি নাই।' কিন্তু বাবা কিছুতেই তাহাদিগকে ভয়ে এবং লজ্জায় পড়িয়া দধি খাইতে দিলেন না।" (এই ঘটনাটী পণ্ডিত মহাশয় উক্ত চন্দ্রমোহন বাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন।)

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আরও বলিয়াছেন—"প্রায় ২২।২৩ বৎসর গত হইল একবার আমাদের গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বহু গণককে স্বীয় কোষ্ঠী দেখাইয়া জানিতে পাইলেন—আগামী ৬২ বৎ বয়সে ষড়্দশা ও ত্রিপাপ স্থিতিতে তাঁহার নিশ্চিত মৃত্যু হইবে। তাঁহার ইচ্ছা, যদি নিশ্চিতই মরিতে হয়, তবে কোন তীর্থ স্থানে যাইয়া মরিলেই ভাল। মৃত্যু নিশ্চিত কিনা জানিবার জন্য লোকমুখে শুনিয়া বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট চলিয়া গেলেন। বাবা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন আসিয়াছ?" ব্রাহ্মণ কহিলেন—'গণকেরা বলিয়াছে আগামী ৬২ বর্ষে আমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু গণকের বাক্যে

সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। যদি নিশ্চতই মৃত্যু হইবে জানি, তবে কোন তীর্থস্থানে যাইয়া মরাই ভাল মনে করিয়া, নিশ্চিত মৃত্যু হইবে কিনা জানিবার জন্য ত্রিকালদর্শী যোগীপুরুষ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।' ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—'তোমাকে কুষ্ঠরোগে ধরিয়াছে দেখিতেছি। যাও, বাড়ী ফিরিয়া যাও, সম্প্রতি কোথাও যাইতে হইবে না। দশ পনর বৎসর পরে পারিলে একবার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও।' এই ব্রাহ্মণ অদ্যাপি জীবিত আছেন. তাঁহার বয়স এখন ৮২।৮৩ বৎসর হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মচারিবাবার অদ্ভুত শক্তি ও বিভূতির পরিচায়ক এইরূপ কত ঘটনা বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা নাই।

ব্রহ্মচারিবাবা অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। একবার একটী যোগী আসিয়া তাঁহার আশ্রমে পঞ্চাগ্নি যাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবা তাঁহার আরম্বর ও আস্ফালন দেখিয়া তাঁহাকে গর্ব্বিত ও স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যগ্র জানিতে পারিয়া এমনভাবে স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিলেন, যে যোগী আর পঞ্চাগ্নি যজ্ঞ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না। হঠাৎ এমন নিবিড় বৃষ্টিপাত হইল যে যজ্ঞের অগ্নি তখনই মেঘজলে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। যোগী লজ্জায় অধোবদন হইয়া তখনই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। (বাবার একজন ভক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের নিকট আমরা একথা জানিতে পাইয়াছি।)

তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমরা কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িতাম। কখনও তিনি তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং বুঝাইয়া দিলে বুঝিতাম—আমরা অজ্ঞান, তাঁহার কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়া ভাল মন্দ বিচার করা আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও অনভিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে কি উদ্দেশ্যে কি করিতেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত।

তিনি অনেক সময়ে অনধিকারী, অজ্ঞান ও কপট তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে লইয়া নির্দ্দোষ কৌতুক ও আমোদ করিতেন। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—'একদা ঢাকা কলেজের এল, এ ও বি,এ, ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র আসিয়া বলিলেন আমরা আপনার নিকট ব্রহ্ম জানিতে আসিয়াছি, আমাদিগকে উপদেশ দিন'। ব্রহ্মচারী কহিতে লাগিলেন—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ যাহা অখণ্ডমণ্ডলাকার, যদ্দারা চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এহেন ব্রহ্মকে যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার করি। তাঁহারা কহিলেন—'আপনাকেই গুরু করিব।' ব্রহ্মচারী কহিলেন—'আচ্ছা সে হবে—এই শ্লোকটী বুঝিলেত? তাঁহারা কহিলেন—'কিছু কিছু বুঝি—আপনি বুঝাইয়া দিন।' ব্রহ্মচারী কহিলেন—'তোমাদের পক্ষে ব্রহ্ম কি জান?—টাকা। কারণ টাকাগুলিও অখণ্ড এবং মণ্ডলাকার, চরাচর জগতে উহারই প্রভুত্ব চলিতেছে। তোমরা সেই টাকাব্রহ্মের দর্শনের জন্য

দীক্ষিত হইয়াছ। অধ্যাপক নামে গুরু তোমাদিগকে সেই টাকা ব্রহ্ম লাভ করার পথ দেখাইয়া দেন। অতএব এখন সেই অধ্যাপক গুরুরই অনুসরণ করিতে থাক। পরে টাকা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিলেও যদি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্রহ্ম দর্শন করিবার অভিলাষ উৎপন্ন হয়, তখন আমার নিকট আসিও। তখন যাহা বক্তব্য হয় বলিব'।

তাঁহার যে কীদৃশী মহীয়সী শক্তি ছিল, তাহা না দেখিলে প্রত্যয় হয় না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। জগতে ইচ্ছা করিলে কিছুই তাঁহার অসাধ্য বা শক্তির বহির্ভূত ছিল না। এবিষয়ে আরও একটী অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিয়া সম্প্রতি প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"বারদাতে নাগ জমিদারদের মধ্যে বাবু রাজমোহন নাগ মহাশয় অন্যতম। রাজমোহন বাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ উমাপ্রসন্ন নাগ। তাঁহার পত্নী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া কয়েক মাস পরে সূতিকারোগে জীবন ত্যাগ করেন। তিন মাসের বালকটী স্তন্যের অভাবে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল। এমন কোন দুগ্ধবতী ধাত্রী পাওয়া গেল না যাহার স্তন্য পান করিয়া শিশুটী জীবিত থাকিতে পারে। তখন উমাপ্রসন্ন বাবুর শ্বশুর কুলের লোক আসিয়া বালকটীকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যায়। সেখানে তাহারা হিন্দু ধাত্রীর অসদ্ভাবে একজন মুসলমান ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া শিশুর স্তন্যপানের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু জানি না কোন অনির্বচনীয় কারণে শিশুটীর মুসলমান ধাত্রীর স্তন্য

পান সহ্য হইল না। মুসলমান ধাত্রীর স্তন্য পান করিয়া বালকটী আবার মৃত্যুদশায় পতিত হইল। ঘোরতর উদরাময় রোগ আসিয়া তাহার কোমল শরীর আক্রমণ করিল। বালকের মাতুলকুল নিরুপায় হইয়া বালককে পুনরায় তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখন বালকের জীবনরক্ষার কি উপায় হইবে, পিতা এই সমস্যায় পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। উমাপ্রসন্নের এক ভগিনী আছেন, তাঁহার নাম সিন্ধুবাসিনী; তখন তাহার বয়স ৩০ বৎসর, ইনি জন্মবন্ধ্যা। এই বিপদের সময়ে সেই শিশুবৎসলা পিসিমা শিশুর জীবনরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার পতিকে বাবা শিশুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন বুকের দুধের অভাবে সে ছেলেটী মারা যায়। বাবা বলিলেন সিন্ধুকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও। সিন্ধু তখন ব্রহ্মচারীর আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বালকটীকে মহাপুরুষের চরণে নিক্ষেপ করিয়া কাতর স্বরে শিশুর জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তুমি কেন শিশুকে স্তন্য দান করিয়া বাঁচাওনা?" নাগ কন্যা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইয়া নম্রবদনে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"বাবা একি বলিতেছেন? আমি যে জন্মবন্ধ্যা; আমার বুকে দুধ থাকিলে আর চিন্তার বিষয় ছিল কি?" ব্রহ্মচারী কি চিন্তা করিয়া বলিলেন—"মা! আমার কাছে আসিয়া বস দেখি, আমি তোমার স্তন্য পান করিব।" নাগ কন্যা তাহাই করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী সরলস্বভাব শিশুর ন্যায় অসঙ্কুচিত ভাবে মাতৃজ্ঞানে

নাগ দুহিতার স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সিন্ধুবাসিনীর স্তনে মুখ সংযোগ করিবামাত্র তাঁহার স্তন্যদ্বয় দুগ্ধভারে স্ফীত হইয়া তাহা হইতে অনর্গল দুগ্ধ ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাগকন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার বদনে স্তন্যার্পণপূর্ব্বক ভক্তিভরে ব্রহ্মচারীর চরণে পুনঃ পুনঃ মস্তক অবনত করিয়া আনন্দমন্থরগতিতে নেত্রনীরে নিষিক্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুমূর্ষু বালক গৃহে আসিয়া প্রচুর স্তন্য পানে দিন দিন পরিপুষ্ট ও সুস্থকায় হইয়া উঠিল। এই বালক অদ্যাপি জীবিত আছে। ব্রহ্মচারীর কৃপায় জীবন লাভ করিয়াছিল বলিয়া ঐ বালকের নাম 'ব্রহ্মপ্রসন্ন' রাখা হইয়াছে। সে এনট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার আকৃতি ও শক্তিশালী দেহ দেখিলে বাবার কৃপার কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। সিন্ধুবাসিনীও এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। তিনি এখনও বন্ধ্যা অবস্থায় সধবা আছেন। তাঁহার বয়স এখন ৫০ বৎসরেরও উপরে। এই ঘটনাটী বারদী নিবাসী ছোট বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত, অনেকেই সুবিদিত। (বাবার অন্যতম শিষ্য শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয় অল্পদিন হইল গুরুপাটদর্শনে বারদী যাইয়া এই অদ্ভুত ঘটনাটী উমাপ্রসন্ন ও তাহার ভগিনী উভয়ের মুখে শুনিয়া এবং বারদীর বহুলোকের মুখেও ইহার সত্যতা অবগত হইয়া আসিয়া জানাইয়াছেন।)

ব্রহ্মচারিবাবা বারদী অবস্থান সময়ে তাঁহার পুণ্য-প্রতিভা

ও তপোবল যখন দেশ দেশান্তর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, দেশ দেশান্তর হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বহু লোক যখন তাঁহার শরণাগত হইতেছিল ঠিক এমনই সময়ে, ভাওয়ালের স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরেরও ব্রহ্মচারিবাবাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মিল এবং তিনি সপরিষদ সেখানে যাত্রা করিলেন। যাওয়ার সময় সঙ্গীদিগের সহিত ব্রহ্মচারিবাবাকে প্রণাম সম্পর্কে বাদানুবাদ হইল। রাজা বলিলেন "জাতির যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা কিংবা পায়ের ধূলি নেওয়া হইবে না।" কিন্তু পরে যখন ব্রহ্মচারিবাবার কাছে পঁহুছিলেন, তখন সে কথা স্মরণ রহিল না। তাঁহার সন্নিহিত হওয়া মাত্র সর্ব্বাগ্রে রাজাই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পায়ের ধূলা নিতেই ব্রহ্মচারি-বাবা হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাবা! প্রণাম করিবে না বলিয়া ত মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলে"? তখন রাজা ও তাঁহার পারিষদেরা সকলেই অবাক্ অপ্রস্তুত।

রাজাবাহাদুর এখন হইতে বৈষয়িক, শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে যখন যে সন্দেহ মনে উদয় হইত তখনই সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বাবার নিকট উপস্থিত হইতেন এবং এমন সদুত্তর পাইতে লাগিলেন যে তিনি ব্রহ্মচারিবাবার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে রাজাবাহাদুরের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ-গণের শ্মশানক্ষেত্রকে শ্মশানেশ্বর বলা হয়। সেখানে প্রত্যেক

মঠেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজাবাহাদুরের ব্রহ্মচারিবাবার উপরে এরূপ অটল বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি বাবাকে জীবন্ত শিব বলিয়াই মনে করিতেন এবং ঐ শ্মশানেশ্বরে একটা নবনির্ম্মিত মন্দিরে জীবন্ত শিব প্রতিষ্ঠা করিবেন এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, বাবাকে বারদী হইতে উঠিয়া শ্মশানেশ্বরে যাইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বাবা স্বীকৃত হন নাই। বলিয়াছিলেন "আমি ত সর্ব্বত্রই আছিরে"। এই রাজাবাহাদুর একবার ফটোগ্রাফের যন্ত্রাদিসহ হস্তিপৃষ্ঠে বারদী আশ্রমে যাইয়া বাবার ফটো উঠাইয়া নিয়া আসেন এবং সেই ফটো হইতেই এখন আমরা বাবার ফটো ও তৈলচিত্রাদি পাইতেছি। এই জন্য বাবার শিষ্যেরা রাজাবাহাদুরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বাবা প্রথমতঃ ফটো দিতে চাহিয়াছিলেন না, বলিয়াছিলেন, "এই দেহ ত অনিত্য, ইহার আবার একটা চিত্র রাখিয়া কি হইবে? যা যা আমার ফটোর দরকার নাই।" রাজাবাহাদুর বলিলেন, "বাবা এতদূর হইতে যন্ত্রাদিসহ এত পরিশ্রম করিয়া আপনার ফটো তুলিবার সঙ্কল্প নিয়াই আসিয়াছি, তবে কি ফিরিয়া যাইব?"

বাবা বলিলেন "ফটো দ্বারা কার কি উপকার হইবে?" রাজাবাহাদুর বলিলেন "আপনার মত মহাপুরুষের ছবি যাহার ঘরে থাকিবে, তাহার গৃহ পবিত্র হইবে, সেই গৃহস্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। কেবল তাহাই নহে এই ফটো বিক্রি করিয়া ও একজন লোকের জীবিকা চলিতে পারিবে। আপনি অনুগ্রহ

করিয়া একটু বাহিরে বস্থন, আমি আমার বাঞ্ছিত কার্য্য করিয়া যাই।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা যদি এমনই হয়, তবে আমি বাহির হইতে পারি।" পরে ফটো নেওয়া হয়। কিন্তু একবার বই দুইবার ফটো নিতে দেন নাই।

এই যাত্রায় কি যাত্রান্তরে ঠিক বলিতে পারি না, তিনি হস্তী সোয়ার হইয়া বহু লোকজন সহ বাবার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন বাবা বলিলেন, "এখন যাইস্‌না, কিছুকাল পরে যা"। কিন্তু রাজাবাহাদুর ব্রহ্মচারি-বাবার সেই সামান্য উপরোধ রক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। কতকদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, প্রবল ঝড় বৃষ্টি আসিতেছে, দেখিয়া রাজাবাহাদুর ফিরিয়া আসিলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিয়া আসিলে কেন?" রাজাবাহাদুর—"ঝড় বৃষ্টি আসাতে ফিরিয়া আসিলাম।" বাবা বলিলেন, "ভালই করিয়াছ"। বৃষ্টি থামিলে হাতী সাজাইয়া পুনরায় রাজাবাহাদুর যাত্রা করিলেন। কতকদূর অগ্রসর হইলে প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, রাজাবাহাদুর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। এইরূপে যতবার আশ্রম হইতে বহির্গত হন তত বারই প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন বুঝিলেন এই প্রবল বৃষ্টির আক্রমণ ব্রহ্মচারীর ইচ্ছামতে সংঘটিত হইতেছে। তখন বাবার চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন— "বুঝিলাম, আপনি ছাড়িয়া না দিলে আমি কোন ক্রমেই যাইতে পারিব না। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ফিরিয়া

যাইতে অনুমতি করুন।" ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"আমি ত প্রথমেই বলিয়াছিলাম, কিছুকাল থাকিয়া যাও। সে কথা না শুনিয়া যাওয়াতে বৃষ্টি ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন যাইতে পার।"

বাবার দেহরক্ষার পরে তাঁহার সমাধির উপরে মন্দির করিয়া দিবার জন্য রাজাবাহাদুর অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বারদীর জমিদারগণ নিজেরাই ঐ কার্য্য করিবেন, নিজেদের জায়গায় অন্যকে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দিলে মানের হানি হয় বলিয়া মন্দির প্রস্তুত করিতে দেন নাই।

পেন্সনপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব এম্, এ, মহাশয় হইতে প্রাপ্ত—

প্রিয় যামিনীবাবু!

শ্রীশ্রীমদ্ ব্রহ্মচারিবাবার জীবনচরিতের পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ পাঠ করিলাম। পূর্ব্ববঙ্গে এই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে পরিচিত এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল নহে। কত পিপাসিত প্রাণ এই সিদ্ধপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে! বস্তুতঃ তিনি অমৃতের প্রস্রবণ ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কেহই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়ার ন্যায় লোকের মনোগত ভাব তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইত। তিনি অন্তঃদর্শী ছিলেন। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনি জানেন তাঁহার দেহপরিত্যাগ এক অলৌকিক

ঘটনা। যোগীগণ যোগযুক্ত হইয়া কিরূপে এই দেহের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এই মহাপুরুষ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই ১২৯৭ বাঙ্গালা সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ভারতের ইতিবৃত্তে এক বরণীয় দিন—আমার তখন পাঠ্যাবস্থা, আমি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলাম, মহাপুরুষ বারদী ছিলেন; তথাহইতে তাঁহার মৃত্যুর কোন খবর পাই নাই কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার সময় কিম্বা তার পরদিন প্রাতঃ সময় আমার ঠিক মনে নাই, শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আমার বাল্য সহচর ও পরমাত্মীয় সহোদর কল্প ৺ যোগজীবন গোস্বামী মহাশয়ের চিঠি হইতে ব্রহ্মচারিবাবাজীর দেহত্যাগের খবর প্রথম প্রাপ্ত হই। যোগজীবন সেই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব প্রভুপাদ ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ গোস্বামী মহাশয় অধিকাংশ সময়েই সমাধি অবস্থায় থাকিতেন। বারদীতে দেহরক্ষা করিবার সময়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে সমাধিস্থ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচারিবাবা স্বয়ং এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। সমাধি ভঙ্গান্তে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের নিকট এই সংবাদ অবগত হইয়া যোগজীবন আমার নিকট এতৎসম্বন্ধে চিঠি দেন। সেই দিনই ঢাকা হইতে আমার এক বন্ধুর চিঠিতেও মহাত্মার দেহত্যাগের সবিস্তার বর্ণনাযুক্ত চিঠি প্রাপ্ত হই এবং দেখিতে পাই যে যে সময় ব্রহ্মচারী গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রকাশিত হন ঠিক সেই সময়েই বারদীতে দেহরক্ষা করেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে চিঠিখানা হারাইয়া ফেলিয়াছি, অনেক অনুসন্ধানেও পাইলাম না। এইরূপ মহাত্মার জীবনী ঘরে ঘরে আদৃত হউক। লিপি প্রণালীতে আপনি গ্রন্থখানি শিক্ষা বিভাগের উপযোগী করিয়া দেশবাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতি—সন ১৩।৭।১৫”

আমরা এই স্থানেই ব্রহ্মচারিবাবার অলৌকিক জীবনকাহিনী শেষ করিলাম। অতঃপর তাঁহার লৌকিক জীবনী সম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

ব্রহ্মচারিবাবার লৌকিক জীবন কাহিনী।

এদেশে লোকালয়ে অবস্থিত ও সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম প্রচারক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, রাজা, মহারাজা, কর্ম্মবীর, পণ্ডিত, ধনী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগেরই যখন জীবনী লিখিবার রীতি প্রচলিত নাই, তখন জনসমাজের বহির্ভূত, লোকচক্ষুর অগোচর, সংসারবিরক্ত, অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদিগের জীবনী যে লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইবে না, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ব্রহ্মচারিবাবার জীবনী সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন্ গ্রাম, নগর বা দেশকে পবিত্র অলঙ্কৃত ও উন্নত করিয়াছেন; কোন্ বংশে উদ্ভূত হইয়া সেই বংশের চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করিয়াছেন; এবং কোন্ পিতা ও মাতার ঔরসে ও গর্ভে আবির্ভূত হইয়া পিতার পিতৃনাম সার্থক

করিয়াছেন এবং মাতাকে বহুগর্ভা সংজ্ঞায় বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে জানিবার উপায় নাই। তবে প্রসঙ্গক্রমে কোন কোনও শিষ্যের নিকট আত্মজীবনী সম্বন্ধে যে দুই এক কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া দুচার কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সিদ্ধজীবনীর প্রণেতা ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"১১৩৭ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭৩০ খৃঃ অব্দে) পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত বারাসতের অধীন (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে লোকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺রামকানাই ঘোষাল, মাতার নাম ৺কমলাদেবী। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমি গুরুদেবের নির্দ্দেশ মতে তাঁহার জন্মস্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় যাইয়া তথাকার বর্ষীয়ান অধিবাসী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বংশের কোনও নিশ্চিত পরিচয় পাইলাম না। কোনও এক বৃদ্ধ বলিলেন—'এই বংশীয় কোন কোনও ব্যক্তির নাম আমাদের পুরাতন কবলাপত্রে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই বংশের কেহ ইদানীং আমাদের গ্রামে নাই। বহুদিন যাবৎ তাহাদের বংশের লোপ হইয়াছে। অথবা তাহাদের বংশীয়েরা অন্যত্র কোথায় যাইয়া বাস করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেবকে গ্রামের অবস্থা জানাইলে, তাহাই তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

লোকনাথের পিতার ইচ্ছা হইয়াছিল পুত্র জন্মিলে একটীকে

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী করিয়া দিবেন। সেকালের লোকের এক দৃঢ় সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল যে বংশের মধ্যে যদি এক ব্যক্তিও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন, তবে তাঁহার চৌদ্দপুরুষের উদ্ধারসাধন হইয়া যায়। তাঁহার পিতা এই বলবান সংস্কারের বশীভূত হইয়া প্রথম হইতেই এই অভিপ্রায় সাধনের চেষ্টায় ছিলেন। প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই তিনি তাঁহাকে ব্রহ্মচারী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু পত্নী নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন করাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে আরও দুই কুমারের জন্ম হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণী সেই দুইজনকেও কিছুতেই ব্রহ্মচারী করিতে সম্মত হইলেন না।

তৎকালে লোকনাথের জন্মস্থানের নিকটেই ভগবান্ গাঙ্গুলী নামে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দেশের সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে ঋষিবৎ পূজা করিত। শ্রাদ্ধাদি কোন সুবৃহৎ কর্ম্মোপলক্ষে ভারতবর্ষের নানাদিগদেশবাসী পণ্ডিত সমাজের সমাগম হইলে, সেই পণ্ডিতসভায় একমাত্র ভগবান গাঙ্গুলীই সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় মীমাংসার মধ্যস্থ হইতেন। তাঁহার অসাক্ষাতে বা অনুপস্থিতিতে শাস্ত্রীয় কোন পূর্ব্বপক্ষেরই মীমাংসা হইত না। ভগবানের কনিষ্ঠ সহোদর গঙ্গাধর এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উপাধিধারী পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"কলিকাতার পূর্ব্বদিকে বারাসত ও টাকি পর্য্যন্ত

প্রসারিত রাস্তার নিকটে কচুয়া (কাঁকড়া) গ্রামে বাঙ্গালা ১০৮৮ শকে (কি ইহার নিকটবর্ত্তী সময়ে) রাঢ়ীয় কুলীনবংশে ভগবান গাঙ্গুলীর জন্ম হয়। ভগবান্ সর্ব্বানন্দীমেলের কুলীন, রাঘব গাঙ্গুলীর সন্তান। আমি লোকনাথের প্রমুখাৎ ভগবান্ গাঙ্গুলীর মাহাত্ম্য শুনিয়া কচুয়াতে গিয়া ভগবানের বংশের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এখন আর ভগবানের বংশ কচুয়াতে বাস করেন না; তাঁহারা স্থানান্তরে গিয়াছেন।" ভগবান্ যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এমন নহে, সাধনমার্গেও তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। লোকনাথের পিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্হিত উল্লিখিত সঙ্কল্পের কথা এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভগবান গাঙ্গুলীকে জানাইয়া তৎসম্বন্ধে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতিকূলতার কথাও তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন এবং এবিষয়ে তাঁহার উপদেশ চাহিলেন।

এদিকে তাঁহার পত্নীর চতুর্থ গর্ভে গুরুদেব লোকনাথের জন্ম হইল। জানি না কোন অজ্ঞেয় কারণবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রসূতি এবার আপনা হইতেই অগ্রবর্ত্তী হইয়া পতিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি এতদিন আপনার বলবতী আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিয়াছি; ইদানীং এই নবজাত বালককে লইয়া আপনি স্বকীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। পত্নীর এই কথা শুনিয়া পতির আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ শুভ সংবাদ লইয়া পণ্ডিতপ্রবর ভগবান্ গাঙ্গুলীকে জানাইলেন। ভগবান্ যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া নবপ্রসূত

কুমারের জাত কর্ম্মাদির ব্যবস্থা করিলেন। ভগবান্ বুঝিতে পারিলেন এ বালক অবশ্যই সামান্য বালক হইবে না। যিনি তাদৃশ কঠোর দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উপযোগী হইবেন, এতদিন সেই পুরুষই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। নতুবা প্রসূতি এতদিন পতির একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনা সত্ত্বেও অগ্রজাত পুত্রদিগের মধ্যে একটীকেও ব্রহ্মচারী করিয়া দিতে সম্মত না হইয়া, ইদানীং বিনা প্রার্থনায় আপনা হইতেই ইঁহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন কেন? নিশ্চয়ই নবজাত শিশুর হৃদয়ে ভাবি মহত্ত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। অতএব প্রথম হইতেই ইঁহার জন্মান্তরীণ উৎকৃষ্ট ও উন্নত সাধু সংস্কারগুলি ক্রমে প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া উচিত হইবে। ব্রহ্মচারী ভারতী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছেন—তাঁহার গুরুজনেরা শৈশবকালেই তাঁহার নিকট জ্ঞানের নিগূঢ় কথা সকল উত্থাপন করিয়া, যাহাতে তাঁহার মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা পাইতেন।

দেখিতে দেখিতে লোকনাথের বাল্যকাল চলিয়া গেল, উপনয়নের সময় আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভগবান্ গাঙ্গুলী লোকনাথের আচার্য্য গুরুর পদে বৃত হইলেন। ভগবান্ লোকনাথকে লইয়া, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইতে সম্মত হইলেন। লোকনাথের মাতাপিতা পণ্ডিত ভগবান্ গাঙ্গুলীকে নিরতিশয় সম্মান করিতেন; এই প্রস্তাবে তাঁহারা উভয়েই যারপরনাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

যে দিবস লোকনাথের উপনয়নের দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, ঐ দিন উপনয়নের অতি প্রশস্ত দিন ছিল বলিয়া গ্রামে আরও অনেক বাড়ীতেই যজ্ঞোপবীতের আয়োজন হইয়াছিল। তবে লোকনাথ উপনীত হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর সহিত বনবাসী হইতে চলিলেন, এই হেতু তাঁহার উপনয়ন ক্রিয়াটী গ্রামের মধ্যে একটী বিশিষ্ট ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত আচার্য্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলীও চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া যাইতেছেন, এই বার্ত্তা অতি সত্বর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রামে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লোকনাথের এক বাল্যসহচর ছিল, তাহারও ঐদিনে উপনয়ন হওয়া নিশ্চিত হইয়াছিল। উপনয়নের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে বেণীমাধবও লোকনাথের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। বেণীর অভিভাবকেরা প্রথমে ইহাকে বালসুলভ চাপল্য বলিয়াই উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বালকের নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা ও অরণ্যবাসের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা প্রদর্শন করিয়া নানাপ্রকারে তাহাকে প্রবোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বালক কিছুতেই তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। তাঁহারা যতই বাধা বিপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন, ততই বালকের বনগমনের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা, পণ্ডিতগণের অভিমত লইয়া, কর্ত্তব্যাবধারণে বাধ্য

হইলেন। অনেক অনুকূল ও প্রতিকূল তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, ভগবান্ গাঙ্গুলী বালকদিগের উভয়েরই আচার্য্যগুরু হইয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন এবং উভয়কেই সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবেন।

নির্দ্ধারিত দিবসে বালকদ্বয়ের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। উপনয়নের পরেই ভগবান্ ব্রহ্মচারিদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া জন্মের মত গৃহত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। যে সময়ে ভগবান (অনুমান ১১৪৮ সনে) সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলেন তখন তাহার বয়স অনুমান ৬০ ষাট বৎসর হইয়াছিল। তাঁহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে কালীঘাটে যাইয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। এই সময়ে কালীঘাট নিবির জঙ্গলময় ছিল। তখন ইংরেজেরা এদেশের রাজা হন নাই। তাঁহারা বর্ত্তমান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুতানটী নামক স্থানে সওদাগরী করিতেন। ব্রহ্মচারীরা যখন কালীঘাটে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনেকগুলি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীও তথায় বাস করিতেছিলেন। লোকনাথ, ভারতী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন—"আমি ও বেণী এই অভিনব জীবদিগকে পাইয়া বিলক্ষন তুষ্ট হইলাম। কয়েকদিন বাস করিয়া কালীঘাটকে নিজ বাড়ী ঘরের মত করিয়া তুলিলাম। সাধুরা যখন চুপ করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন বালস্বভাবসুলভ চপলতা-বশতঃ আমরা (তাঁহাদের) কাহারও জটায় হস্তার্পণ করিতাম, কাহারও বা লেংটী স্পর্শ করিতাম, তাঁহারা কিছুই বলিতেন না।

আমরা প্রশ্রয় পাইয়া উঁহাদের জটা ও লেংটী ধরিয়া টান দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতাম। সাধুরা আমাদের উপদ্রব কয়েক দিন সহ্য করিয়া অবশেষে গুরুদেবকে জানাইলেন। গুরুদেব উত্তর করিলেন—'আমাকে বলেন কেন? আমি ত গৃহী। ইঁহারা আপনাদের লোক, আপনারা ইঁহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লউন। আমি আপনাদেরই দুইটী লোককে গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি'। এই উত্তর শুনিয়া তাঁহারা আর গুরুদেবকে অনুযোগ দিতে পারিলেন না এবং আর কিছু করিলেন না। তাহার পর গুরু আমাদিগকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন—'তোমরা যে উঁহাদের জটা খসাইয়া ফেল, লেঙ্‌টী ধরিয়া টান, বড় হইলে যখন অন্যেরা তোমাদের জটা ও লেংটা ধরিয়া টানাটানি করিবে তখন কি করিবে?' আমি বলিলাম—সে কি? আমরা পৈতার দিনে চেলির কাপড় পরিয়াছি, আমাদের জটা ও লেংটা হইবে কেন?' গুরু বলিলেন—'তোমরা ঐসকল ছাড়িয়া উঁহাদের মত হইতে আসিয়াছ, তাহা কি এখনও বুঝিতে পার নাই?' আমি বলিলাম—'আমরা যদি উঁহাদের মত হইতে আসিয়া থাকি, তবে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া খান, আর আমাদের ঘর হইতে খরচ আইসে কেন?' গুরু বলিলেন—'তাহাও আমাদের ভিক্ষা স্বরূপ। আমরা এখানে আছি এই কথাটা আমাদের পরিত্যক্ত বাটীতে প্রকাশ থাকা হেতু তথা হইতে খরচ আসিয়া থাকে'। আমি বলিলাম—'তবে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে,

শীঘ্র কোনও দূরতর স্থানে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য'। গুরু তাহাই করিলেন—আমরা কালীঘাট ছাড়িয়া চলিলাম"।

"ব্রহ্মচারী আরও বলিয়াছেন—নূতন কোনও ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে বা কোথাও যাইতে হইলে গুরুদেব আমাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চলিতেন'। ভারতী মহাশয় বলেন,—ইহার কারণ এই যে লোকনাথের ভিতর দিয়া স্বভাবতঃ যেটা প্রস্ফুটিত হইত গুরু তাহা বিশেষ মূল্যবান্ হওয়ার সম্ভাবনা করিতেন। লোকনাথের স্বাভাবিক গতি রোধ না করিয়া সেই ভাবের বিকাশ হইতে দেওয়ার যত্ন করিলেই সিদ্ধির সাহায্য করা হইবে, গুরু ইহাই মনে করিতেন।"

কালীঘাট ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীরা প্রায়শঃ বনে বনেই বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহারা নক্তব্রতনামক বিশেষ নিয়মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করাকে 'নক্তব্রত' বলে। ভগবান্ ব্রহ্মচারীদ্বয়কে জঙ্গলে রাখিয়া, দিবার শেষ ভাগে ভিক্ষালব্ধ তিল ও দুগ্ধদ্বারা একপ্রকার অন্ন প্রস্তুত করিয়া শিষ্যদিগকে খাইতে দিতেন এবং নিজেও খাইতেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—'আমরা প্রত্যহ সেই তিল ও দুগ্ধ-মিশ্রিত অন্ন খাইয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলাম, যে তাহা আর খাইতে ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা মনে করিতাম—গৃহস্থেরা অন্য খাদ্য সামগ্রী ভিক্ষা দেয় না কেন?' ব্রহ্মচর্য্যের নিমিত্ত যে এতাদৃশ খাদ্যই প্রশস্ত, তাঁহারা তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ব্রহ্মচারিবালকদ্বয় তখন গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেও, উদরজ্বালায়, সেইরূপ খাদ্যই উদরসাৎ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইতেন। সাধু-নামধারী গুরুরা শিষ্যদিগকে বিনা বেতনে হদ্দ খেজমত করাইয়া ছাড়েন। আমাদের ব্রহ্মচারিদ্বয়ের কিন্তু গুরুর সহিত তেমন ভাব ছিল না; বরং গুরুই উল্টা শিষ্যদিগের খেজমত করিতেন। অথচ তাঁহাদের নিকট কোনরূপ প্রত্যাশা ছিল না। শিষ্যদ্বয়ও জন্মান্তরীণসংস্কারবশে বাল্যাবস্থায়ই গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন।

বনে আসিয়া তাঁহারা যে নক্তব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই ব্রতের উদ্যাপন ২।৩ বৎসরে হয় নাই। তাঁহারা এই ব্রত ৩০।৪০ বৎসর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন; তখন ব্রহ্মচারী গুরুকে বলিয়াছিলেন—আমরা যুবক শিষ্যদ্বয় জঙ্গলে বসিয়া খাই, আর তুমি, বৃদ্ধ এবং গুরু, লোকালয় পর্য্যটন করিয়া ভিক্ষা করিয়া আমাদের উদর পূরণ কর; এটা আমাদের নিকট ভাল বোধ হইতেছে না। এখন হইতে আমাদিগকেই ভিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত কর না কেন?" গুরু বলিলেন—"না, তেমন করিলে তোমাদের একনিষ্ঠতা থাকিবে না। গৃহস্থদিগের বিবিধ ভাব দেখিয়া তোমাদের চিত্ত-মধ্যে তাদৃশ চিন্তা সকল উদিত হইয়া তোমাদের যোগ নষ্ট করিয়া দিবে।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারী একদা গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—'যাহারা সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী হন, তাহাদিগকে বিবিধ শাস্ত্রবেত্তা হইতে দেখা যায়, কিন্তু আপনি আমাদিগকে কোন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেছেন না কেন? এমন কি সংস্কৃত ভাষাটী পর্য্যন্তও আমাদিগকে শিখাইলেন না। আমরা কেমন ব্রহ্মচারী হইব?' গুরু বলিলেন—"তোমরা শাস্ত্রশিক্ষার কষ্ট স্বীকার করিবে কেন? আমিইত সকল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি। তোমাদের জন্য যখন যে শাস্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক হইবে, তাহা আমার নিকটই পাইতে পারিবে। তোমরা যখন আমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছ, তখন আমার অধীত বিদ্যা বিনা অধ্যয়নে তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইবে। তোমরা যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন কর, তবে আমার আদেশের প্রতি তোমাদের তর্ক উপস্থিত হইবে। এখন যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হও, তখন তেমন পারিবে না; আমার আদেশ শাস্ত্রসঙ্গত হইল কিনা এই কথা লইয়া বাদবিতণ্ডা করিবে। অতএব তোমাদের মন স্থির হওয়ার বাধা ঘটিবে।" কথাপ্রসঙ্গে লোকনাথ ইহাও বলিয়াছেন—উপনয়নের সময়ের চেলির কাপড়টিকে তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দড়া পাকাইয়া পরিয়াছিলেন।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরু শিষ্যদ্বয়কে কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাহাতে জন্মান্তরীণ উৎকৃষ্ট সংস্কারগুলি তাহাদের অন্তঃকরণে বিকশিত হয়, গুরু সর্ব্বদা সেই উপায় দেখিতেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোনও অসৎ সংস্কার

উদিত হইয়া, সৎ সংস্কার বিকাশের বাধা জন্মাইলে, গুরু বিবিধ উপায়ে সেই বিরুদ্ধ সংস্কার সমূলে উৎপাটন করিতে যত্নবান্ হইতেন। এই নিমিত্ত শিষ্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ ভাবের উদয় ও বিলয় হইতেছে, গুরু সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা তাহা পরীক্ষা করিতেন।

যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহাদের মধ্যে এমন একটা নিয়ম আছে যে জন্মভূমিত্যাগের দ্বাদশ বৎসর পরে যে কোনও এক সময়ে আসিয়া জন্মভূমি দর্শন করিয়া যাইতে পারেন। এই নিয়মানুসারে আমাদের ব্রহ্মচারিরাও জন্মভূমিত্যাগের প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পরে একবার জন্মভূমি-দর্শনে আসিয়া অল্পকাল তথায় বাস করিয়া গিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারিদ্বয় নক্তব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তৎপরে 'একান্তরা' আরম্ভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ একদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া পরের দিন আহার করিতেন। এই একান্তরা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, ত্রিরাত্র উপবাস, পঞ্চাহ উপবাস, নবরাত্র উপবাস— প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এমন কি অবশেষে একমাস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। যাহারা একদিন উপবাস করিয়াই, ক্ষুধার জ্বালায়, প্রাণ গেল বলিয়া ভয়ে বিহ্বল হন, তাহাদের নিকট একমাস উপবাসের কথা নিতান্তই অলীক ও অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। ব্রহ্মচারিবাবা সর্ব্বদাই শিষ্যদিগকে 'অসম্ভবং ন বক্তব্যম্' এই বলিয়া কাহারও নিকট অসম্ভব কথা বলিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

তথাপি এগুলি তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি বলিয়া পরম সত্য জ্ঞানে আমরা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যতগুলি কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহার সকল কথাই যে সকলে বিশ্বাস করিবেন এমন নহে, পক্ষান্তরে অনেক কথাই সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। তাহা হইলেও আমরা যাহা প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া জানি ও বিশ্বাস করি, তাহা না লিখিলেও একপক্ষে সত্যের অপলাপ-জনিত পাপ পঙ্কে নিতান্তই লিপ্ত হইব। কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস তাঁহারা বেশী দিন অভ্যাস করেন নাই। ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—"এই একমাস-ব্যাপী উপবাস আমি দুইবার মাত্র অনুষ্ঠান করিয়াছি। বেণী-মাধব একবার মাত্র এই উপবাস করিয়াছেন, দ্বিতীয় বার আর সম্পূর্ণ একমাস উপবাসী থাকিতে পারেন নাই।"

ভারতী লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—'উপবাসের কালে যাহাতে আমাদের কোনরূপ অঙ্গসঞ্চালন করিতে না হয়, সে বিষয়ে গুরু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন। এমন কি, মলমূত্র ত্যাগের জন্যও শরীর নাড়াচাড়া করিতে গুরুর নিষেধ ছিল। মলমূত্র ত্যাগ করিলে, গুরু আসিয়া জলশৌচাদি সমাধা করাইয়া দিতেন এবং আমাদিগকে ধরিয়া তুলিয়া পরিষ্কার স্থানে বসাইতেন, তাহার পর বিষ্ঠা সরাইয়া স্থান পরিষ্কার করিতেন।' আমরা চাহিয়া দেখিয়াছি—এই সকল কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারীর চক্ষুজলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত। বারদীর ব্রহ্মচারীর ন্যায় মহাত্মাও যেমন কোথাও দৃষ্ট হয় না, তাঁহার গুরুভক্তির তুলনাও কোথাও

মিলে না। গুরুর কথা স্মরণ করিয়া যে তিনি কিরূপে গলিয়া যাইতেন, তাহা পার্শ্বস্থ সকলে বুঝি টের পাইত না। ধন্য গুরুভক্তি! বলি হারি যাই! আমি তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া গুরুভক্তির গুরুত্ব অনুভব করিয়া আর তাঁহাকে গুরু বলিতে ভরসা পাই নাই। আমাদের গুরু-সম্বোধন, কথার কথা মাত্র। তাঁহার গুরুভক্তি তেমন সহজ নহে, উহা ব্রহ্মচারীর হৃদয়ের সহিত জড়িত ছিল।"

ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—'ব্রহ্মচর্য্যের প্রথমাবস্থায় যেমন গুরু তাহাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া রাখিতেন, পরে আর সেরূপ না করিয়া তাহার বিপরীত করিতেন। তখন গুরু তাহাদিগকে লইয়া যেখানে লোকযাত্রা (মেলা) হয়,—যেখানে বহুলোকের জনতা হয়, সেই সেই স্থানে লইয়া যাইয়া তথায় বসাইয়া দিতেন। বহুলোকের মধ্যে মনঃসংযমের ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহারা আপত্তি দেখাইলে, গুরু বলিতেন—'নির্জ্জনে চিত্ত স্থির করা যেমন অভ্যাস করিয়াছ, জনতার কলরবের মধ্যেও তেমন করিয়া চিত্ত স্থির করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।' তৎপরে তাহারা, গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া, সেইরূপ করিতে আর আপত্তি করেন নাই।

এইরূপে গুরু তাঁহাদিগকে মশক-পিপীলিকাদির উপদ্রব সহ্য করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। একদিন একস্থানে লোকনাথ গুরুকে বলিয়াছিলেন—'এখানে পিপড়ায় বড় যন্ত্রণা দেয়, স্থানান্তরে গেলে হয় না কি?' তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া পড়িয়া থাকিয়া দেখিলেন—গুরু তাঁহাদের অগোচরে চিনি ছড়াইয়া পিপীলিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছেন। তখন বুঝিলেন—পিপড়ার কামড় অভ্যাস করাইবার জন্যই এরূপ করা হইতেছে। তদবধি পিপীলিকাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান নিরূপণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এইরূপে মশাসম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারীরা যেমন একদিকে উপবাসাদি বাহ্য ক্রিয়া অভ্যাস করিতেন, তেমন অন্যদিকে আবার আভ্যন্তরক্রিয়া সমাধিরও অভ্যাস করিতেন এবং অন্তর্বিজ্ঞান খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই সময়েই লোকনাথ ব্রহ্মচারী তপশ্চর্য্যার অবশ্যম্ভাবিফলস্বরূপ জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী ইতিপূর্ব্বে তদীয় অলৌকিক জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি না।

জাতিস্মরতালাভের পর পূর্ব্বজন্ম স্মৃতিপথে উদিত হইলে, যেরূপে তিনি পূর্ব্বজন্মের জন্মভূমি বেড়ুগ্রামে উপনীত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তথাকার বাড়ী, ঘর, খাল, বিল, নদী, বৃক্ষ প্রভৃতি চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহাও ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ইহার পর ব্রহ্মচারী সিদ্ধিলাভের জন্য হিমালয় পর্ব্বত গমন করেন। বলা বাহুল্য ব্রহ্মচারীর নিত্য সহচর বেণীমাধব এবং গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীও এই সঙ্গে ছিলেন। হিমালয় যাইবার অব্যবহিত প্রাক্‌কালে তাঁহারা বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছিলেন।

ব্রহ্মচারী, ভারতী মহাশয়ের নিকট বলিয়াছেন—"বর্দ্ধমানে কোনও কালীমূর্ত্তির পূজারি ব্রাহ্মণ দেবতাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে জানিত। আমি এই রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট ক্রমাগত যাতায়াত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। আমি কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না। একটা মানুষকে উপাসনা করিয়া বশীভূত করা আর কত বড় কথা! বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে অল্পদিনেই তিনি আমার বাসনা পূর্ণ করিলেন। কহিলেন—'আমি কোনও দেবতাকে আয়ত্ত করিয়াছি। সেই দেবতা প্রত্যহ আমাকে আট আনা করিয়া প্রদান করেন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যে কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া থাকেন।' তখন আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি হিমালয়ে যাইয়া বাস করিব, তথাকার শীত আমার সহ্য হইবে কিনা? উত্তর হইল—'হইবে'। এ উত্তরটা আমিও শুনিতে পাইলাম। তখন আমি পূজারিকে বলিলাম—আমি স্বয়ং একটা প্রশ্ন করিতে চাই, দেখিব, আমার কথার উত্তর দেন কিনা? আমি প্রশ্ন করিলাম—হিমালয়ে যাইয়া আমি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইব কিনা? পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর না পাওয়াতে, পূজারিকে প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলে পর উত্তর হইল—'সিদ্ধিলাভ হইবে'। আমি তখন আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলাম। এই পূজারি

মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচ করিত না। অপবিত্র অবস্থায়ই মায়ের অর্চ্চনাদি করিত।"

হিমালয়ে যাইয়া অবস্থানের পর যথাকালে লোকনাথ **পরমসিদ্ধি** লাভ করিলেন। তাঁহার এই পরমসিদ্ধি কি? তাহা আমরা এস্থানে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় তিনি কর্ম্ম করিতে করিতে **কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি** লাভ করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মযোগদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও অকর্ত্তা এবং দেহধারী হইয়াও দেহসম্বন্ধবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেন।

ভারতী লিখিয়াছেন—"যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারী সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গুরুদেবের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। গুরু কারণজিজ্ঞাসু হইলে কহিলেন 'আমি ত পার পাইলাম, তুমি এখনও সংসারসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ। তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি এত খাটিয়া আমাকে পার করিলে, আমি মুক্ত হইলাম; আর তুমি তটান্তরলাভের আশায় উন্নেত্র হইয়া অনন্তকালের প্রতীক্ষায় পরতীরে দাঁড়াইয়া রহিলে; কিরূপে যে তোমার উদ্ধার হইবে, ভাবিয়া আমি আকুল হইতেছি।' গুরু কহিলেন—'আমি চিরদিন জ্ঞানপথের পথিক।

কর্ম্মদ্বারা যে এরূপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এতকাল আমি একথা বিশ্বাস করি নাই। অতএবই সিদ্ধিলাভের জন্য তোমার ন্যায় এতদূর যত্ন করিতে পারি নাই। এখন তোমাকে কর্ম্মপথে চালাইয়া, কর্ম্মযোগে তোমাকে এই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া, এতদিনে আমি শিক্ষালাভ করিলাম। আমি এই দেহ পাত করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার শিষ্য হইব। তখন তুমি আমাকে এই পথে চালাইও।'

ব্রহ্মচারীর সিদ্ধিলাভের কিছুকাল পরেই ভগবান, ব্রহ্মচারিদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া, কাশীধাম যাত্রা করেন। পথে, হিতলাল মিশ্র নামক এক সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয়। চারিজনেই একসঙ্গে কাশী চলিয়া আইসেন। ভারতী লিখিয়াছেন—এই হিতলাল মিশ্রই এক সময়ে কাশীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীর গত দুই জন্মের কথা স্মরণ ছিল, হিতলাল গত তিন জন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন। কাশীতে আসিয়া চারিজনেই একত্র বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লোকনাথ ও বেণীমাধবের বয়স ৯০।৯৫ ১০০ বৎসর হইয়াছিল, তথাপি ভগবান্ তাঁহাদিগকে বালক বলিয়াই মনে করিতেন। একদিন ভগবান্ শিষ্যদ্বয়কে হিতলালের হাতে সমর্পণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন—অতঃপর আমার এই বালক দুইটার ভার তোমার উপর অর্পিত হইল, তুমি ইহাদের ভার গ্রহণ কর।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে একদিন ভগবান্ শিষ্যদিগকে কহিলেন—'অদ্য গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিয়া কিছুকাল জপ

করিব। তোমরা আমার প্রতিক্ষায় থাকিও।' এই বলিয়া তিনি গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে জপে বসিলেন। লোকনাথ তাঁহার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। গঙ্গার ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে জপে নিবিষ্ট দেখিয়া ভাবনা দূর করিলেন। কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরে তাহার শরীর ধরিয়া বলিলেন—"তোমার আবার জপ!" তাঁহার অঙ্গ স্পর্শেই ভগবানের দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন তিনি জানিতে পাইলেন, গুরু দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। লোকনাথ তাঁহার নিমিত্ত কোন শোকও করেন নাই। তৎপরে যথাবিধানে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহের দাহসংস্কার সম্পাদন করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্য শেষ করিলেন।

এই সময়ে ব্রহ্মচারী দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস জানিতে পাওয়া যায় নাই। এবিষয়ে ভারতী মহাশয় স্বপ্রণীত সিদ্ধজীবনী গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বারদীর ব্রহ্মচারীর ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ তাঁহার উত্তর ও পূর্ব্বদিক যাত্রার কথা, নব্য সমাজের পক্ষে বিশ্বাসের অযোগ্য এবং প্রচলিতবিজ্ঞান বিরুদ্ধ। আমরা প্রথমে তাঁহার পশ্চিমদিক্ যাত্রার বিষয় বর্ণন করিতেছি। এই ব্যাপার ব্রহ্মচারীর গুরুর মৃত্যুর পূর্ব্বে কি পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কাররূপে জানা যায় নাই। তবে কিনা, এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গুরুর বিষয় কিছুই

ব্যক্ত করেন নাই। (উত্তর ও পূর্ব্বদিক্ যাত্রার সময়ে যে তাঁহার গুরু বিদ্যমান ছিলেন না—তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন)। আমরা অনুমান করি তাঁহার পশ্চিম যাত্রাতেও গুরু ছিলেন না। ব্রহ্মচারী আমার জিজ্ঞাসামতে বলিয়াছেন—'আমার পশ্চিম-যাত্রার সীমা সমুদ্র পর্য্যন্ত।' আমি ভাবিলাম তাহা হইলে আরব সাগরের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত গিয়া থাকিবেন; কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম আমার এই অনুমান ঠিক নহে। যে সকল মুসলমান, মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহাদিগের সহিত মক্কা ও মদিনার অবস্থাদি জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। তাহাতে যে সকল উত্তর প্রত্যুত্তর হইত, তদ্দ্বারা তাঁহার মক্কা ও মদিনার গমন স্পষ্টরূপে বুঝিয়াছি। পরে তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্টতঃ তাহা বর্ণনাও করিয়াছেন। পাঠকগণ এপর্য্যন্ত শুনিয়া, আমাদের ন্যায়, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব-তট তাঁহার পশ্চিম যাত্রার শেষ সীমা মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাহাও সমীচীন নহে। একদা কতিপয় ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে কথোপকথন করিতেছিলেন যে, অমুক ইংরেজী শব্দটা ফরাসিগণ কর্তৃক এরূপ ভাবে উচ্চারিত হয়। তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মচারী ফরাসীদের ঐরূপ দুই চারিটী শব্দের উচ্চারণ করিয়া তাহাদের দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এরূপ স্বীকার করিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার পশ্চিমদিক যাত্রার শেষ সীমা আমরা আটলাণ্টিক মহাসাগরকে স্থির করিতে পারি। তৎসম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার আর বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ হয়

নাই। মক্কা ও মদিনার যাত্রাসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি হাটিতে হাটিতে মক্কাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এতদ্দেশীয় হিন্দুদের সংস্কার আছে যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে মক্কায় যাইতে দেয় না। কদাপি কেহ গেলে, যবনান্ন ভক্ষণ করাইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া লয়। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। আমি তথায় উপস্থিত হইলে, মুসলমানেরা আমাকে বিশেষ যত্ন করিয়া আমার আতিথ্যসৎকার করিয়াছিল। তাহারা আমাকে বলিয়াছিল—'আপনি স্বয়ং রসুই করিয়া খাইতে ইচ্ছা করেন, সিধা গ্রহণ করুন। নতুবা আদেশ করিলে আমরাও রসুই করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' আমি শেষোক্ত কথায় সম্মত হইলাম। তাহারা, অতি পবিত্র হইয়া, কাপড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া, আমার জন্য রন্ধন করিতে লাগিল। মুখ বাধার তাৎপর্য্য এই যে, রন্ধন করিতে করিতে সহসা কথা কহিলে পাক দ্রব্যে থুথু পতিত হইয়া তাহা অপবিত্র করিতে পারে।

তথা হইতে মদিনাতে যাই। সেখানে একস্থানে উপবেশন করিয়া থাকিলাম। তথায় সমাগত মুসলমানগণ আমার আহারের জন্য বড় বড় লাড্ডু রাখিয়া চলিয়া যাইত। এইরূপ প্রত্যহ আমার নিকট প্রচুর লাড্ডু সমানীত হইত। আমি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে, ভক্ষ্যাবশেষ তাহারা আদর করিয়া ভোজন করিত। এখানকার মুসলমানেরাও মক্কাবাসীদের ন্যায় মুখ বাঁধিয়া রসুই করিয়া আমাকে ভোজন করাইয়াছে। ওখানে যাইয়া আমার মক্কেশ্বরদর্শনেচ্ছা বলবতী হইল। শুনিলাম,

পশ্চিমদিকে মরুভূমির মধ্য দিয়া দুই তিন মাস গমন করিলে মক্কেশ্বরে যাওয়া যাইতে পারে। আমি তদুদ্দেশ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু মক্কেশ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটে নাই। কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করিলে 'আবদুল গফুর' নামক এক মহাপুরুষের সন্ধান পাইলাম। মুসলমানেরা তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করে। তিনি একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন; কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলেন না; আমি অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার দর্শন পাইয়া, নিকটে গিয়া উপবেশন করিলাম, তিনি আমার প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না। আমি ধীরে ধীরে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম; তাঁহার কোনও সাড়াশব্দ নাই। তথাপি আমি বিরত হইলাম না। মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কয়দিনের লোক?' আমি ত প্রশ্ন শুনিয়াই অবাক। বুঝিলাম, নিশ্চয়ই তিনি আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেন নাই। ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ভাব আছে। আমি চিন্তামগ্ন হইলাম; ভাবিলাম কত জন্মের কথা স্মরণ আছে, তাহাই জানিতে চাহিয়াছেন। উত্তর করিলাম—'আমি দুইদিনের লোক। আপনি কয়দিনের?' তিনি কহিলেন, 'আমি চারিদিনের মনুষ্য অর্থাৎ আমার চারি জন্মের কথা স্মরণ আছে।' পরে বিস্তর আলাপ হইতে লাগিল; জানিলাম, দাক্ষিণাত্যে কোনও ক্ষত্রিয় বংশে তাঁহার এই জন্ম হইয়াছে।"

পাঠক এপর্য্যন্ত পড়িয়া মনে করিতে পারেন যে, ঐ মহাপুরুষ

ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, পশ্চাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে 'আব্দুল গফুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া, গত তিন জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন, তিনি কখনও বাহ্য সমাজবন্ধনে বাধ্য থাকিতে পারেন না। এই ভাবটী আমার স্বকোপল কল্পিত নহে। গুরুদেব লোকনাথ ব্রহ্মচারীও সমাজবন্ধন মানিতেন না; স্পষ্ট বলিতেন—'আমরা অসামাজিক লোক'। তবে তাঁহার দেখাদেখি পাছে অন্যেরা সমাজবন্ধন না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এইজন্য তিনি লোকালয়ে আসিয়া অনেকটা সমাজের অনুসরণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।'
(গীতা)।

'আমি কর্ম্মক্ষম হইয়াও যদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকলাপ অতিক্রম করি, তবে সকল মনুষ্যই আমার অনুসরণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবে; অতএব আমার কর্ম্ম না করা হেতু, সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।'

উক্ত মহাপুরুষ সংসারের এই সকল ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বিদিত হইয়াই জন্মে জন্মে লোক সমাজের বাহিরে অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন এবং বর্ত্তমান জন্মেও হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া, আরব দেশের মরু প্রদেশে লুক্কায়িত রহিয়াছেন এবং তথাকার

মুসলমান সমাজোপযোগী 'আবদুল গফুর' নামে পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীও তাঁহার 'আবদুল গফুর' নাম পাইয়াছেন। তিনি গত তিন জন্মে যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীর নিকট তৎসমুদয় প্রকাশ করিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেই সকল স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

'আবদুল গফুরের সহিত ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রকার আলাপ পরিচয় হইলে পর, তিনি ব্রহ্মচারীর ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি পাকা লোকের (গুরু ভগবান্ গাঙ্গুলীর) হাতে পড়াতে অত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছ, আমাদের ভাগ্যে এতাদৃশ গুরু প্রাপ্তি ঘটে নাই।'

ব্রহ্মচারী একবার কাবুলে যাইয়া সেক মোল্লাসাদির গৃহে অতিথি হইয়া কোরাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি দেখিয়াছি—একদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বারদীস্থ আশ্রমে একজন জগন্নাথ দেবের পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখে জগন্নাথের প্রসাদ অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। পাণ্ডার বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রেই দেবদেবীর প্রসাদ ভক্ষণের জন্য লালায়িত। কেবল পাণ্ডার কেন, খাঁটি হিন্দুমাত্রেরই তাদৃশ ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়। ব্রহ্মচারী পাণ্ডাকে প্রসাদ হস্তে ধাবমান দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'আমি মুসলমান'। পাণ্ডা অমনি প্রত্যাবৃত্ত হইল। পরে পাণ্ডাকে দুই চারিখানা পয়সা দিয়া বিদায় করা গেল। তাঁহার মুখে "আমি মুসলমান" এই কথা শুনিয়া সেখানকার সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল, সেজন্য

ব্রহ্মচারী তাদৃশ উক্তির এই ব্যাখ্যা করিলেন। 'মুছল্লম ইমান—মুসলমান। আমার ষোল আনা ইমান বিদ্যমান আছে, ইমান পাওয়ার জন্য প্রসাদভক্ষণের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছি।'

ব্রহ্মচারীকে আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার তাদৃশ জ্ঞান লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—'আমরা গুরু শিষ্য মিলিয়া কাবুলে গিযা মোল্লাসাদীর বাটীতে অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট রীতিমত কালেমোল্লা (কোরাণ) পাঠ করিয়াছি।'

এই কোরাণ শিক্ষা জাতিস্মরতা লাভের পূর্ব্বে বা পরে হইয়াছে তাহা স্থির করা যায় না। সম্ভবত জাতিস্মর হওয়ার পূর্ব্বেই কোরাণ শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া কোরাণ শিখিতে হইল কেন? এই প্রশ্ন করাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"আমার গুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের কোনও বিশেষ উপায় বর্ণিত আছে কিনা, এই সন্দেহভঞ্জনের জন্য তিনি নিজেও আমাদের সঙ্গে কোরাণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ফলতঃ জ্ঞানবান্ মনুষ্যের সন্দেহগুলিকে সর্ব্বতোভাবে নিরসন করাই কর্ত্তব্য।"

ইহার পর ব্রহ্মচারী, হিতলাল মিশ্র ও বেণীমাধব তিন জনে মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া সুমেরু যাত্রা করেন। তৎসম্বন্ধে ভারতী মহাশয় অনেকগুলি বৃত্তান্ত সিদ্ধজীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা সুমেরুযাত্রা সম্বন্ধে সকল কথা বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সিদ্ধজীবনী গ্রন্থের 'সুমেরু-যাত্রা'

নামক বৃত্তান্তটী পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমরা এস্থানে সংক্ষেপে মাত্র ২।৪টী কথা বলিব। পরম সিদ্ধিলাভে চরিতার্থ ব্রহ্মচারীর দীর্ঘকাল নিম্নভূমিতে বাস করিয়া আর এই নিকৃষ্ট মর্ত্তলোকে অধিবাস ভাল লাগিল না; তিনি সশরীরে স্বর্গবাসের অভিলাষী হইলেন। তাই তদীয় নিত্য সহচর বেণীমাধবকে লইয়া সুমেরু যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া কিছুকাল কেদারতীর্থে বাস করিয়া শরীরকে হিমালয়ের সুদারুণ শীত সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া লইলেন। এই কেদার তীর্থে ও শীতের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব যে গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন অন্য সময়ে সেস্থানে বাস করা সাধারণ মানবের অসাধ্য। কিছুদিন পরে হিতলাল মিশ্রও তাঁহাদের সুমেরু যাত্রার সহায় হইলেন। যাত্রিত্রয় তিন বৎসরকাল কেদার তীর্থে অবস্থান করিয়া দেহকে শীতপ্রধান প্রদেশে বরফের উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত করিয়া লইলেন। পরে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি যে পথে স্বর্গ গমনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন সেই পথ ধরিয়া ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তাহারা সুমেরু উদ্দেশ্যে প্রায় দশবৎসর কাল ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিতে চলিতে, অবশেষে এমন একস্থানে যাইয়া উপনীত হইয়াছিলেন, যেস্থানে সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই, যাহা নিরন্তর নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত। যাইবার পথে তাঁহারা মানস-সরোবরের তীরে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মানসসরোবর আমাদের তিব্বত দেশীয় মানসসরোবর নহে। উহা পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। শাস্ত্রে ইহা 'উত্তরমানস' নামে উল্লিখিত আছে। তাঁহারা সেই অন্ধকারময় দেশে চলিতে চলিতে শেষে আর অগ্রসর

হইতে পারেন নাই। নিরন্তর বরফরাশির মধ্য দিয়া চলিবারও পথ পাইলেন না। অবশেষে সেই অন্ধকারাবৃত দেশে কিছুকাল অবস্থান করিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে কিছুকাল থাকিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তির এমন এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, যে তখন তাঁহারা বিড়ালের ন্যায় অন্ধকারেও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের গাত্রে কোনও আবরণ ছিল না; তাঁহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিলেন। কিন্তু বিধির অনির্ব্বচনীয় বিধান-মতে তাঁহাদের গাত্রের উপরে শ্বেতবর্ণ এমন এক চর্ম্মাবরণ জন্মিয়াছিল যে সেইহেতু তাঁহাদিগকে শীতের অসহ্য কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাঁহারা তখন যে দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন সেই দেশের অধিবাসীদের শরীরের প্রমাণ এক কি দেড়হস্তের অধিক নহে। তাঁহাদের বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র। তাঁহারা ইঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারেন নাই। প্রথমে এই আশ্চর্য্য মনুষ্যাকৃতি জীবেরা তাঁহাদের সমীপে ঘনাইত না। অবশেষে যখন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ হিংসাদি পরিশূন্য বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন আর ভয় করিত না। এমন কি, তাঁহাদের জন্য ফলমূলাদি আহরণ করিয়া আনিয়া কিঞ্চিদ্দূরে রাখিয়া চলিয়া যাইত। ব্রহ্মচারী উহাদিগের কয়েকটী শব্দও স্মরণ রাখিয়াছিলেন। ইহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে।

ব্রহ্মচারীরা সুমেরুগমনে নিরাশ হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও তাঁহাদের সেই পরিমাণ কাল অর্থাৎ ১০ বৎসর লাগিয়াছিল। ইদানীং তাঁহারা পৃথিবীর যে অংশে অবস্থান করিতেছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় ভূগোলশাস্ত্র

মতে উহার নাম ইলাবৃত বর্ষ।' এই বর্ষ সুমেরু পর্ব্বতের পদতলে অবস্থিত বলিয়া নিরন্তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার পর হিতলালের উদায়চল গমনের ইচ্ছা হইল। লোকনাথও তাঁহার সঙ্গী হইয়া চলিলেন, অতএব বেণীমাধবও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বমুখে চলিয়া হিতলাল ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, 'তোমাদের নিম্নভূমিতে কার্য্য রহিয়াছে, অতএব তোমাদের আর আমার সহিত অধিক দূর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই'। তদনুসারে লোকনাথ ও বেণীমাধব, হিতলালের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতে ফিরিয়া আসিলেন। সেখান হইতে লোকনাথ বারদী আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বেণীমাধব কামাখ্যাভিমুখে চলিয়া যান।

বারদীতে আসিয়া লোকনাথ প্রায় ২৬।২৭ বৎসর ছিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি যে স্বীয় অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলি তদীয় অলৌকিক জীবনের কাহিনীতে ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। লোকনাথ কীদৃশী মহিয়সী শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের আধার ছিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় মায়ামোহান্ধ বদ্ধজীবের বুঝিবার অধিকার নাই। কতকগুলি লোকাতীত আশ্চর্য্য ঘটনাদ্বারা তাঁহার অনন্ত মহিমার পরিচয় করিতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞ ও নির্ব্বোধের কার্য্য। ব্রহ্মচারী বিভূতি দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করিয়া তাহাদের পূজা পাইবার প্রয়াসী ছিলেন না। অনেক সময় তিনি বলিতেন "বিভূতি আমি প্রস্রাব বলিয়া গণ্য করি!" কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন,

যদি ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শন না করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তবে এগুলি দেখাইলেন কেন? তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি—বিভূতিসমূহ সিদ্ধমহাপুরুষদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীপ্তি পায় বা দগ্ধ করে; সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মিসকল আপনা আপনিই বাহির হয়, জল যেমন স্বভাবতঃই তৃষ্ণা নাশক এবং শীতল, সিদ্ধমহাপুরুষেরাও সেইরূপ স্বভাবতঃই বিবিধ ঐশ্বর্য্যের আধার এবং তাঁহাদের ব্রহ্মশক্তি আপনা আপনিই বিকাশ পায়, কোনও চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। শুষ্ককাষ্ঠ যেমন অগ্নিসংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়, মনুষ্যেরাও সেইরূপ কর্ম্মক্ষয়ে তাঁহাদের কৃপালাভের যোগ্যতা লাভ করিলে, আপনা হইতেই রোগমুক্ত ও দারিদ্র্যবিরহিত হইতে এবং বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে অধিকারী হয়। যিনি আত্মারাম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন, বাহ্যজগতের সঙ্গে, বাহ্য বস্তুর সহিত যাঁহার সম্পর্ক ও তিরোহিত হইয়াছিল, সাংসারিক পাপ পুণ্যের সহিত যাঁহার সম্বন্ধই ছিল না, আত্মপ্রীতি ভিন্ন অন্যবিধ আনন্দের অনুভূতি যাঁহার হইত না, অহংবুদ্ধি যাঁহার ত্রিসীমায়ও স্থান পাইত না, তিনি পার্থিব অকিঞ্চিৎকর সম্মান ও যশের জন্য লালায়িত হইয়া ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইবেন, ইহা নিতান্তই বিচারবিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। ব্রহ্মচারী বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, সুতরাং বহির্জগতের সহিত যে যে বিষয়ের অণুমাত্রও সম্বন্ধ আছে, সেই সেই বিষয়ই তাঁহার নিকট অলীক বলিয়া অনুভূত হইত। অতএব বাহ্যজগতে যশঃ, সুখ্যাতি, অখ্যাতি

মান, অপমান, কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না, অথচ তিনি উপস্থিতমত ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া সকল কার্য্যই করিয়া যাইতেন। তাহার শুভাশুভ পরিণামের দিকে একটুও লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃতি যাহা করাইত তাহাই, আত্মাকে অকর্ত্তা জানিয়া তিনি সম্পাদন করিতেন। প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতি করিয়া যাইত, তিনি সাক্ষী স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। আমাদের ন্যায় প্রাকৃত লোকেরা মনে করিতাম, ব্রহ্মচারী ঐ নিমিত্ত এই কাজ করিলেন, না করিলে দোষ হইত। অমুক কাজটা তিনি ভাল করেন নাই, এটা আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেন, অমুকের প্রতি অকারণ সেদিন ক্রোধ প্রদর্শন করিয়াছেন; নিজের খ্যাতি বাড়াইবার জন্য এবং লোকের পূজা পাইবার জন্য অমুক অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহার কিছু করিবার ইচ্ছাও ছিল না। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান থাকিয়াও তাহার নিকট অবিদ্যমানই ছিল। বাহ্যজগতের বিদ্যমানতা স্বীকার জন্য অনেক সময়ে তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মায়ার আশ্রয় লইতে হইত।

বাঙ্গলা ১২৯৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগের দিন ধার্য্য হয়। ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বারদীনিবাসী কোনও একব্যক্তি যক্ষ্মারোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার আত্মীয়েরা ঐ রোগ ব্রহ্মচারীকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। ব্রহ্মচারী মৃত্যুজনক রোগ বলিয়া তাহা প্রথমে লইতে চাহিলেন না। শেষে বিশেষ সাধ্য সাধনাতে রোগটা তুলিয়া লইলেন। রোগী যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্তিলাভ করিল, কিন্তু বাঁচিল না। ২।৪ মাস মধ্যে অন্য

রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এদিকে সেই মৃত্যুজনক কফরোগ ব্রহ্মচারিবাবার শরীরে তাহার পিণ্ডপতনের দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিল। লোকনাথের দেহত্যাগের ২।৪ মাস পূর্ব্বে ঐ কফরোগ অতিশয় প্রবল হইয়া জীবন সংশয় ঘটাইয়াছিল। সাধারণ লোক ঐ অবস্থায় বাঁচিতে পারে না। তিনি যোগী বলিয়া সেই অবস্থা কাটিয়া উঠিয়াছিলেন। তখন তিনি উঠিয়া আস্তে আস্তে হাটিতেন। শরীর ভারী দুর্ব্বল ছিল।

তাহার পর লোকনাথ নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে দেহধারণ করিতে লাগিলেন। ১২৯৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দেহত্যাগের দিন ধার্য্য হইল। প্রাতে উঠিয়া আদেশ করিলেন অদ্য আশ্রমবাসীদের ভোজন ব্যাপার বেলা ৯টার মধ্যে শেষ করিতে হইবে। বেলা ১০টার সময়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন—আশ্রমের সকলেরই আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তখন বাহ্য ব্যাপারের ভাবনা ছাড়িয়া দিলেন। দিন বেশ পরিষ্কার ছিল, দিনমণি উজ্জ্বল কিরণজাল বিকিরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, স্থির হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পৃষ্ঠদেশে হেলান দেওয়ার জন্য একখানি কাষ্ঠফলক বস্ত্রদ্বারা পরিবৃত ছিল। লোকনাথ ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ হইতে পৃথক (আলগ্) রহিলেন। দেহটা কাণ্ডারিবিহীন জীর্ণ তরীর ন্যায় সংসার তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। আসনের ভাব দেখিয়াই সেবকেরা বুঝিলেন, এদেহের পক্ষে ইহাই শেষ আসন। সকলেই উৎকণ্ঠা-

বারদীর আশ্রম ও সমাধি মন্দির।
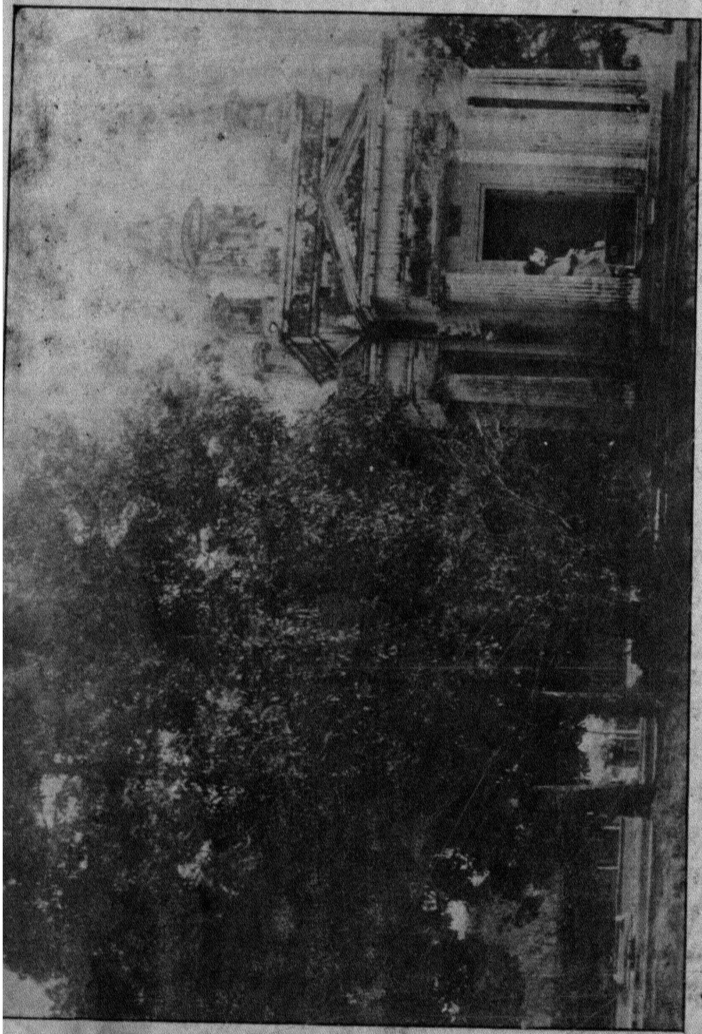
সহকারে চক্ষুর দিকে চাহিতে লাগিলেন। অন্য মুমূর্ষুদিগের নেত্র পলকহীন বিস্ফারিত দেখিলে মৃত বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। লোকনাথের চক্ষুঃ স্বভাবতঃই পলকশূন্য ছিল। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি ধ্যানাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, দেখিলে ইহাই অনুমান হইল। এজন্য পাছে ধ্যানভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় কেহই গায়ে হাত দিতে সাহস পাইল না। কেহ বলিলেন দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন, কেহ বলিলেন—না। কেহ বা দেহের বিশেষ ব্যত্যয় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে বেলা সাড়ে এগারটার পরে সকলে পরামর্শ করিয়া দেহ স্পর্শ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্পর্শে ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় বুঝিলেন—তিনি ইহার কিছু পূর্বেই চিরদিনের জন্য দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তৎপরে মহাসমারোহের সহিত ঘৃত ও চন্দন-কাষ্ঠ-দ্বারা চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই দেবদেহের দাহ সংস্কার সমাধা করা হইল। দাহ ক্রিয়ার পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল বারদীর চতুর্দ্দিকে এক প্রহরের মধ্যে হাট বাজার ও গৃহস্থের বাড়ীতে যত ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ ছিল, সকলেই ব্রহ্মচারিবাবার দাহ কার্য্যে নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়াছিল।

অনেকে বলিয়াছেন—যে সময়ে ব্রহ্মচারী বারদীতে দেহত্যাগ করেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে একখানি লাঠি হাতে করিয়া লাঙ্গলবন্ধের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। যে সময়ে এবং যে ভাবে ব্রহ্মচারিবাবা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি যে সূর্য্যভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, দেহত্যাগের সময়ে সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং তিনি পরমব্রহ্মে মিশিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি কখন কখন কোন কোনও শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—"আমার দেহত্যাগ যদি উত্তরায়নে দিবাভাগে হয়

এবং সেই দিন যদি আকাশ নির্ম্মল থাকে, সূর্য্যদেব উজ্জ্বল কিরণ দিতে থাকেন, তবে বুঝিবে আমি সূর্য্যভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছি; আর আমার ইহলোকে পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না।" যখন দেহত্যাগ বাস্তবিকই উত্তরায়নে, দিবাভাগে, প্রখর রৌদ্রবিশিষ্ট ১১ই জ্যৈষ্ঠ ঠিক দ্বিপ্রহরে হইয়াছিল তখন নিশ্চতই বোধ হইতেছে তিনি সূর্য্যভেদ করিয়া পুনরাবৃত্তি রহিত হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকিবেন।

পরিশিষ্ট।

ব্রহ্মচারিবাবার কয়েকজন পরলোকগত শিষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। বারদীতে 'কমলা' নামে এক বৃদ্ধা অবীরা গোপকন্যা বাস করিতেন। এই নিঃসহায়া রমণীকে ব্রহ্মচারিবাবা মা বলিয়া ডাকিতেন। বৃদ্ধা তাঁহার আশ্রমে থাকিতেন এবং ব্রহ্মচারীকে ঠিক পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন ও লালন করিতেন। লোকে তাঁহাকে গোসাঞি মা বলিয়া ডাকিত। আমরা শুনিয়াছি ব্রহ্মচারীর বর্ত্তমান জন্মের মায়ের নামও কমলা ছিল। ব্রহ্মচারী জাতিস্মর ছিলেন—মাতার গত জন্মের বৃত্তান্ত তাঁহার স্মরণ ছিল। তিনি জানিয়াছিলেন তাঁহার মাতা 'কমলা' দেবীই দেহত্যাগ করিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই গোপরমণীর আচার ব্যবহার কার্য্যকলাপ, মানসিক উন্নতি ও উদারতা প্রভৃতি আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তদ্দারা ব্রহ্মচারীর এই উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছি। এমন পবিত্র ও আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্না নারী ব্যতীত অন্য কেহই ঈদৃশ মহাত্মার গর্ভধারিণী হইবার যোগ্যা নহেন। ইনি প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিয়া কয়েক বৎসর হইল জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জানিনা এরূপ নির্ম্মল সত্ত্বসম্পন্না হইয়াও কোন অজ্ঞাত দৈবদুর্ব্বিপাকে গোয়ালার ঘরে আসিয়া দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার যেমন যুগপৎ পুত্রবাৎসল্য ও পরম ব্রহ্মজ্ঞানে অচলা ভক্তি ছিল ইঁহারও ব্রহ্মচারীর প্রতি সেইরূপ বাৎসল্য ও ভক্তি ছিল। তিনি ব্রহ্মচারীকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া জানিতেন। শতবর্ষ বয়সেও প্রতিদিন স্নান করিয়া স্বহস্তে ব্রহ্মচারীর ভোগ পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন পূর্ব্বক সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসেও যথাসময়ে নিজ হস্তে ভোগ পাক করিয়া ব্রহ্মচারীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করতঃ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরদিন বেলা ৪ চারি দণ্ডের সময়ে সজ্ঞানে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। আমরা শুনিয়াছি বাবা যখন প্রথমে বারদী আসিয়া বাস করেন তখন এই গোসাঁই মা প্রতিদিন তাঁহার

আহারের দুধ যোগাইতেন। একদিন দুধের পাত্র হঠাৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া কতক দুধ পড়িয়া যায়। বৃদ্ধা অন্য দুধের অসদ্ভাবে কিঞ্চিৎ জল দিয়া দুধের মান পূর্ণ করিয়া দেন। অন্তর্যামী বাবা জানিতে পারিয়া পরিহাসচ্ছলে বৃদ্ধাকে দুধে জল দেওয়ার বিষয় জানাইয়া দিলেন, বৃদ্ধা সেই হইতেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করিতে থাকেন। বারদীতে একপও জনরব আছে—যে একদা গোসাঁই মা ব্রহ্মচারীকে জগন্নাথদর্শনের অভিপ্রায় জানাইয়া পুরী যাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মচারী "আমিই সেই জগন্নাথ" এই বলিয়া তাঁহাকে স্বদেহে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার ঔৎসুক্য শিথিল করিয়া দেন। আর একবার গোয়ালিনী মাতা কালীঘাটের কালীমাতাকে দেখিতে যাওয়ার মনন করিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট তথায় যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই দিনই বিকালে ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন স্বয়ং ব্রহ্মচারীই শবাসনা লোলজিহ্বা জলদবর্ণা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া আছেন। তদবধি তিনি কালীঘাট যাওয়ার অভিপ্রায়ও পরিত্যাগ করেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন লোকনাথই তাঁহার জ্ঞান, লোকনাথই তাঁহার ধ্যান এবং লোকনাথই তাঁহার জীবন ছিল। লোকনাথের নাম করিতেই তাঁহার বক্ষ নেত্রজলে ভাসিয়া যাইত। লোকনাথ উহার স্বহস্ত পাক অন্ন খাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। তাঁহার সার্ব্বজনীন বাৎসল্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি প্রতিদিন আশ্রমে সমাগত ৮০।৯০ কি ১০০ একশত লোকের পাক ও পরিবেশন অনায়াসে নিজহস্তে সমাধা করিতেন, একটুও বিরক্তি দিল না। বাবাই তাহাকে এই শক্তি দিয়াছিলেন।

২। মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্রহ্মচারিবাবার বিশেষ প্রিয়শিষ্য ছিলেন। ইঁনি বারদীর উত্তরে ব্রাহ্মনদী গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের ভাল ভূসম্পত্তি ছিল। দৈবদুর্বিপাকে অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই রায়পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়ে। পরে মনঃকষ্টে দুইজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক দিন ঘুরিয়া তিনি তাঁহাদের সেবা করেন। সন্ন্যাসিদ্বয় কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করেন- "তোমাকে আবার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে তোমার দুইটী পুত্র সন্তান জন্মিবে; আরও দেখিতেছি মেঘনানদীর পারে কোন একটী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হইবে। তিনিই তোমার গুরু। তাঁহার নিকট যাইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তদনুসারে তিনি সংসারে ফিরিয়া আসেন এবং মেঘনানদীর পারস্থ বারদীর ব্রহ্মচারিবাবার নিকট আসিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে। পত্নীর বয়স তখন ত্রিশ বৎসরেরও উপরে, সন্তানাদি এপর্য্যন্ত জন্মেও ছিলনা, জন্মিবার সম্ভাবনাও ছিল না। জ্যেষ্ঠটীর নাম শ্রীমান হরিদাস রায় এবং কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান্ জানকীদাস রায় এম, এ,। মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। বাবা বহুমূল্য বস্ত্রাদিদ্বারা তাঁহার সাজসজ্জার বন্দোবস্ত করিতেন এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে তাঁহার সকল অভাব পূরণ করিয়া প্রতিপালন করিতেন। ব্রহ্মচারিবাবার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পরেই মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে অনেক যোগবিভূতি প্রকাশ হইতে থাকে। তিনি

সর্ব্বদাই বাবার শ্রীমূর্ত্তি সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর থাকিয়া পার্শ্বস্থ সকলকে আনন্দিত করিতেন। তাঁহার নিকটে আসিয়া অনেকেরই নানাপ্রকার মনোবাঞ্ছার পূরণ হইত। কত দুরারোগ্য রোগী যে তাঁহার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে তাহা গণনা করা যায় না। পরিশেষে ঢাকার কোন একটী আশ্রিত ভক্তের পুত্রের বিষমজ্বর হওয়াতে সে মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাগত হয় এবং সেই রোগটিকে দূর করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রার্থনা করে। তিনি বলিলেন এইটী মৃত্যুরোগ, দূর করিবার উপায় নাই"। কিন্তু রোগীর আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ কোন "মতেই এড়াইতে না পারিয়া ঐ রোগ দূর করিতে বাধ্য হন। রোগী আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু তিনি ঢাকাস্থ আশ্রমে আসিয়াই বলিলেন যে তাঁহার শরীরে ঐ বিষমজ্বর সংক্রামিত হইয়াছে এবং সেই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। বাস্তবিকই ৩।৪ দিন পরেই তিনি ঐ বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জ্বরাবস্থায়ও প্রতিদিনই তিনি স্বহস্তে ভোগ পাক করিতেন এবং ব্রহ্মচারিবাবার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রতিদিনই প্রসাদ পাইতেন। কয়েকদিন পরে তিনি গুরুপাটে বারদীর আশ্রমে যাইয়া নিজ ভদ্রাসনে "দয়ালগুরু, দয়ালগুরু" বলিতে বলিতে জড়দেহ রক্ষা করেন এবং পরমপিতা-শ্রীগুরু চরণপ্রান্তে আশ্রয় লন।

(৩। মহাত্মা সুরথনাথ ব্রহ্মচারীও ব্রহ্মচারিবাবার অন্যতম একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইহার নিবাস ঢাকা জিলা অন্তর্গত সোণারগাঁ পরগণা অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রাম। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইহার লৌকিক নাম ৺ অখিলচন্দ্র সেন। বাবার এই প্রিয়শিষ্যের পূর্ব্বজীবনী বড়ই উচ্ছৃঙ্খল ছিল। ইনিও দেখিতে বড়ই সুশ্রী ছিলেন। প্রকৃতির তাড়নায় ইনি কতকগুলি বড়লোকের সংসর্গে পড়িয়া মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ অনেকদিন গত হইলে অনুতপ্ত হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে বাবার শরণাগত হন। কয়েক বৎসর বাবার সঙ্গলাভে ইহার পূর্ব্বাভ্যাস অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইয়া আসিতে থাকে। ক্রমে তিনি বাবার কৃপার অধিকারী হইলেন। উপযুক্ত সময় দেখিয়া বাবা তখন ইহাকে ব্রহ্মচারীর বেশ গৈরীক বস্ত্রাদি প্রদান করেন এবং "সুরথনাথ ব্রহ্মচারী" নামে আভাহত করেন। বাবার কৃপায় ইনি তখন হইতেই সাধনমার্গে বহুদূর অগ্রসর হইতে থাকেন। ব্রহ্মচারিবাবা ইহার মধ্যেও এমন ঐশীশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন যে ইনিও বাবার মহীয়সী শক্তি ও অনন্ত বিভূতির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া হঠাৎ ১৩১৯ সনের ৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার জড়দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে বাবার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত শিষ্যও বর্ত্তমান আছেন; আশাকরি সুরথনাথের জীবনী শীঘ্রই তাঁহার কোনও কৃতিশিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত হইবে।

৪। মহাত্মা হরিচরণ চক্রবর্ত্তী বাবার একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি ঢাকা জজ-কোর্টে ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে কৃপা করিয়া তাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা প্রদান করেন। ভক্তহৃদয় হরিচরণ আজীবন ঐ কাষ্ঠ পাদুকাই পূজা করিয়া গিয়াছেন। পরে তাঁহার স্ত্রীও ঐ পাদুকা ৺ কাশীধামে গঙ্গাতীরস্থ নারদঘাটে এক বাড়ীতে থাকিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূজা করিয়া গিয়াছেন। এখনও

ঐ পাদুকার যথারীতি পূজা হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সত্যচরণ একবার দুঃসাধ্য পীড়ায় পীড়িত হইলে তিনি তাহাকে নিয়া বারদী যান। সেই সময়ে সত্যচরণের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু বাবা লোকনাথ মুমূর্ষু সত্যচরণকে উঠিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া মাত্র তাহার সমুদায় রোগ সারিয়া যায় এবং সে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় যথেচ্ছা বিচরণ করিতে থাকে। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সারদাচরণেরও কঠিন পীড়া হইয়াছিল। তাহাও ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায়ই সারিয়া যায়। ব্রহ্মচারীবাবা বালক সারদাচরণকেই তাহার ঔষধ নির্ব্বাচনের ভার দেন। শ্রীমানও বাবার আদেশে বালকবুদ্ধিতে একটী লতার অনন্ত হাতে দেয় এবং বাবার কৃপায় তাহাতেই তাহার সমুদায় ব্যাধি সারিয়া যায়। বাবা একদিন হরিচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলিলেন-- "হরিচরণ আমি কল্পতরু হইলাম আমার নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা বর গ্রহণ করিতে পার।" হরিচরণ ও তাহার পত্নী ঐহিক কোনরূপ ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা না করিয়া তাহার উপরেই বর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। ব্রহ্মচারিবাবা তাহাকে সজ্ঞানে ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে সংসারাসক্তিবিহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করিবার বর প্রদান করেন। বস্তুতঃ তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রী পুত্র কন্যা কাহাকেও তাঁহার নিকটে আসিতে দেন নাই কেবল ব্রহ্মচারিবাবার রূপ ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

শেষ নিবেদন।

বহুদিন যাবৎ আমি একা বসিয়া মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম গুরু লোকনাথ কোন গুণে আমাকে কৃপা করিলেন? ইহার উত্তর বহুকাল আমি খুজিয়া পাই নাই। ইদানীং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আলোচনায় জানিলাম পূর্ব্বপুরুষদের সাধন-সম্পত্তি অনেক সময়ই উত্তরাধিকারীসূত্রে পরবর্ত্তীতে অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্রও সংক্রামিত হয়, সেই মূলধন কেহ কেহ বা বাড়াইয়া যান, কেহ কেহ বা নষ্ট করিয়া যান। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ভরদ্বাজ অঙ্গিরা এবং বৃহস্পতি। আমি তাহাদের বংশধর এই কথা স্মরণ করিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করি; এবং আনন্দসাগরে ভাসিয়া যাই। কিন্তু হায়! পেখমধারী ময়ূর যেমন আপন পায়ের দিকে দৃষ্টি করা মাত্রই ম্রিয়মান হয় এবং তাহার পেখম ভাঙ্গিয়া যায় সেই প্রকার আমাকেও যখন আমি আচারভ্রষ্ট সাধনভজনবিহীন যজনাদি শূন্য দেখি তখনই ক্ষোভে ও দুঃখে কাতর হই। তবে প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ বিবরণ আমি কিছু কিছু স্মরণ করিতে পারি। প্রপিতামহেরা কীর্ত্তিনারায়ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ এই দুই ভাই ছিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণের পাঁচ পুত্র (১) শম্ভুনাথ (২) বিশ্বনাথ (৩) কাশীনাথ (৪) রঘুনাথ (৫) গৌরীনাথ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের তিন পুত্র (১) রাজচন্দ্র (২) মাধবচন্দ্র (৩) রূপচন্দ্র। এই আট ভ্রাতা এক বাড়ীতে এক পরিবারের মত থাকাকালীন সকলেই

বিশেষ উপার্জ্জনক্ষম হন। দান এবং দয়াদ্বারা তাহারা দেশে বিদেশে যশস্বী হন। বিক্রমপুর বেজগাঁ গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থান। এখনও দেশে বিদেশে ইঁহাদের বাড়ী মুন্সী বাড়ী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে কাশীনাথের স্ত্রী মহামায়া দেবী কাশীনাথের শবদেহ সহ স্বেচ্ছায় সহমরণ গিয়াছিলেন; এখনও সেই চিতার উপর মঠ তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

৺ গৌরীনাথের একমাত্র পুত্র আমার পিতা ৺ গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই পুত্র। শ্রীযুত কামিনীকুমার ও আমি যামিনীকুমার। পিতা আমার অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। সাংসারিক কার্য্যবশতঃ কোনও সময় রীতিমত পূজা না করিতে পারিলে তাঁহার মাতার চরণে ফুল চন্দন প্রদান করিলেই তাঁহার পূজা হইল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

৺ কাশীধামে তিনি সজ্ঞানে ৺ অন্নপূর্ণা দেবীর চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন। পিতৃদেবের যে দিবসে ৺ কাশীধামে দেহত্যাগ ঘটে সেইদিন রাত্রেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজগাঁও গ্রামে জপে বসিয়া মাতাঠাকুরাণী পিতৃদেবের দেহ পরিত্যাগের বিষয় জানিতে পান। প্রাতে সকলকে বলেন "আমি গতকল্য বিধবা হইয়াছি"। তখন পর্য্যন্তও দেশে টেলিগ্রাফের প্রচলন ছিলনা। ইহার পর ৺ কাশীধামে যাইয়া মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর উপদেশ প্রার্থী হইলে তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন—"নন্‌কো মার"।

ধন্য আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যের ফল। তাঁহাদের পুণ্যের ফলেই আজ আমিও ব্রহ্মচারিবাবার ন্যায় গুরু পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

ধন্য গুরু লোকনাথ। তুমি গুরুগীতায় উক্ত "গুরু ভবরোগের বৈদ্য" বাক্যের সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছ। তোমার কি আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম শিরাজ্ঞান। কি সুন্দর কৌশলে তোমার নিকট আগত প্রত্যেক ভবরোগীকেই তাহার উপযোগী ব্যবস্থা দিয়াছ। প্রত্যেকেরই জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকেই তাহাতে পরিতৃপ্ত। কেহই অন্য উপদেশের অপেক্ষা করেনা, আশাও রাখেনা। ধন্য তোমার ভবরোগের অব্যর্থ ঔষধ। এই প্রকার অমোঘ ঔষধদাতা ভবরোগের গুরু এই জগতে অতি বিরল। কি আশ্চর্য্য কৌশলেই সেই ঔষধ শিষ্যের অজ্ঞাতসারে দিন দিন তাহাকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করাইতেছে! গুরো, তোমার করুণার মহিমা বুঝা ভার। প্রিয় এবং অপ্রিয় বাক্যদ্বারা, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ দ্বারা সমানরূপেই তুমি তোমার শরণাগতের উপকার করিয়াছ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

প্রশংসাপত্র।

ভূদেব বাবুর পুত্র বাঁকীপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের অভিমত :—

"বারদীর ব্রহ্মচারী মহাত্মা তাঁহার শিষ্য, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সময়ে সময়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন গ্রন্থকার এই পুস্তকে সেই অনল্প মহার্ঘ উপদেশাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সহজ ও অল্প কথায় বাস্তবিকই হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি এই গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ শীঘ্রই হইবে এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দুমাত্রেই ব্রহ্মচারী মহাত্মার উপদেশ বলী হইতে সরল ভাষায় উচ্চাধিকারী জন্য আর্য শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বসকল জানিতে পারিবেন।"

কলিকাতা হাইকোর্টের অনারেবল জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অভিমত :—

"নমস্কার নিবেদন আপনার প্রেরিত ধর্ম্মসার সংগ্রহ পুস্তক পাইয়া অনুগৃহীত ও সুখী হইয়াছি। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আপনি হিন্দুসমাজে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভারতী কৃত সিদ্ধজীবনী ও ব্রহ্মচারী বাবার ফটো কোথায় পাওয়া যায় জানিতে পারিলে আনাইয়া লইব। তাং ২১।৭।০৩

ঢাকার আবকারী বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কোরাণতত্ত্ব প্রণেতা মৌলবী মোহিনদ্দীন আহাম্মদ মহোদয়ের অভিমত :—

"**ধর্ম্মসার-সংগ্রহ** পুস্তকখানা আমি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছি। এই পুস্তকে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্রও নাই, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি এই পুস্তক পাঠ করিয়া বহু উপকৃত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থখানা এমন সুন্দর, এমন উপাদেয় এবং এমন সময়োপযোগী হইয়াছে যে আমার মনে হয়, ইহা আল্লার ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হইয়াছে।"

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে এই পুস্তকখানাকে আদর করিতেছে। বাস্তবিক ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালাভাষায় আর নাই। পুস্তকখানা গীতা পত্রিকার মত প্রত্যেক ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া আশা করি।"

"পঞ্চায়েৎ পত্রিকা" ঢাকা।

Sj. Rajendra Chandra Sastry, M.A. Transla
Bengal Sectretariat wrote :—

"The book embodies the life and teachings of th
celebrated saint of East Bengal known as Bai
Brahmachary. The Brahmachary was a great person,
and his life and teachings possess a unique value. T
book eminently deserves to be read by the people w
hanker after spiritual life. It has a high moral valu
and it should be placed in the hands of our young men."

Sj. Mahammad Mustafi, Special Inspecting Officer for Urdu Education,, Bhagalpur writes :—

"I have been greatly profited by reading Dharmasar-Sangraha. The collection is excellent and the teaching it aims at is rather universal in its scope and is non-sectarian which makes the book acceptable to all creeds.'

Mr. S, K. Stinton, I. C. S. Additional District Judge, Dacca writes :—

"The anecdotes of the Brahmachari's sayings and doings in simple Bengali appear suitable for use in schools by reason of the language in which they are written and the excellent moral lessons they convey."